60 YEARS
DIAMOND JUBILEE
KRISHNA CHANDRA COLLEGE
HETAMPUR * BIRBHUM.

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ পত্রিকা

হীরক জয়ন্তী সংখ্যা

ইং ১৯৫৮ খৃঃ

সূচীপত্র

CONTENTS

GOVERNOR OF WEST BENGAL

It gives me much pleasure to learn that the Diamond Jubilee Celebration of the Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum will be held on the 16th February, 1958 and that a Diamond Jubilee Number of its magazine is being issued to mark the occasion.

I wish the institution all prosperity and increasing success in its efforts to impart higher education. May it instil into its students the sense of citizenship so greatly needed today in Free India.

RAJ BHAVAN,
Calcutta,
January 27, 1958.

Governor of West Bengal.

CHIEF MINISTER
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Calcutta
The 29th January 1958

MESSAGE

I am glad to learn that the Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum, will shortly celebrate its Diamond Jubilee. Founded by late Maharani Padmasundari Devi, the college has been a pioneer for the last sixty years in disseminating higher education in the district of Birbhum. May it continue to turn out disciplined and well-educated young men ready to take their part in all walks of life!

(B. C. Roy)

PA/cm/Camp/58

CHAIRMAN

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
OLD MILL ROAD
NEW DELHI-2.

Camp: Poona.

January 23, 1958.

Dear Professor Sanyal,

Your letter of the 17th January 1958. I wish your celebrations every success.

Yours sincerely,

C. D. Deshmukh

(C. D. Deshmukh)

Prof. J. Sanyal,
Organising Secretary,
Diamond Jubilee Celebration Committee,
Krishna Chandra College,
Hetampur, Birbhum.
West Bengal.

SENATE HOUSE
CALCUTTA

21st Jany.1958.

Dear Sir,

Thanks for your letter of 15th January. I am very glad to learn that Krishna Chandra College is celebrating its Diamond Jubilee on 16th February. I wish it had been possible for me to come but I have accepted other engagements for that day as well as for the other days of the next week. So I have to request you to excuse me and I shall have to be content by sending you my best wishes for the success of the Diamond Jubilee Celebrations.

Yours faithfully,

N. K. Siddhanta

(N.K.Siddhanta)

Shri S. N. Chatterji,
Principal, Krishna Chandra College,
Hetampur, Birbhum.

পুরাবৃত্ত

ব্রাহ্মণের নাম মুরলীধর। মুরলীধরের পিতা জীবিকা অন্বেষণে বাঁকুড়া হতে বীরভূমে আসিয়া হেতমপুর গ্রামে বাস করেন। কথায় আছে "তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে"। বীরভূমে আসিয়াও মুরলীধরের দারিদ্র্য ঘুচিল না। অতি কষ্টেই দিনাতিপাত হয়। এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে মুরলীধরের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ১১০৬ সালে। মুরলীধর পুত্রের নাম রাখিলেন চৈতন্যচরণ।

চৈতন্যচরণও অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলেন না। পাঠশালায় ছাত্র পড়াইয়া কোন-রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। চৈতন্যচরণের দ্বিতীয় পুত্র রাধানাথ। জন্ম ১১৬৮ সাল। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া রাধানাথ প্রথমে নীলাম্বর রায়ের, পরে মাণারাম রায়ের অধীনে গোমস্তার কাজ গ্রহণ করেন। ১১৮৪ হইতে ১১৮৬ সাল পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত হয়। পরে তিনি বীরভূম আদালতের পিয়ন নিযুক্ত হন। পদের নাম ছিল "ক্রোক সাজোয়াল"। বাকী খাজনা অথবা দেনার দায়ে দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক করা ছিল তার অন্যতম কাজ। এই কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি রাজনগর রাজের রাজা বাহাদুর জমাল খাঁর কিছু সম্পত্তি নীলামে খরিদ করেন। নীলামের টাকা তাঁহাকে স্থানীয় মহাজনদের নিকট হইতে কর্জ হিসাবে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সম্পত্তিহারা রাজনগররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাধানাথকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। রাধানাথ লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় ১১৯৩ সালে রাধানাথের পুত্র বিপ্রচরণ জন্মগ্রহণ করেন।

১২১০ সালে রাধানাথ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য দশজন ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণের ও তাঁহাদিগকে এক আনা করিয়া দক্ষিণা দানের প্রথাও প্রবর্তিত হয়। ১২৪০ সালে বিপ্রচরণ সরস্বতীপূজা আরম্ভ করেন। ১২৪২ সালে রাধানাথ পরলোকগমন করেন।

বিপ্রচরণের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। জন্ম ১২৩৩ সাল। ১২৫২ সালে বিপ্রচরণ কর্তৃক গোবিন্দ সায়র নামক দীঘি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৫৫ সালে বিপ্রচরণ হেতমপুরে একটি বাঙলা পাঠশালা স্থাপন করেন।

১২৫৭ সালের ৭ই ফাল্গুন কৃষ্ণচন্দ্রের স্বনামধন্য পুত্র রামরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৬ সালে কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামরঞ্জনের বয়স যখন প্রায় এগারো বৎসর তখন ১২৬৮ সালের কার্তিক মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বীরভূমের কালেক্টর জেন্‌কিন্‌স্ তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে লইয়া আসেন এবং বাগডহরী নিবাসী শ্রীমহানন্দ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

১২৭১ সালে, ৭ই বৈশাখ দাঁড়কার রায়বংশের কন্যা পদ্মসুন্দরী দেবীর সঙ্গে রামরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল। রামরঞ্জনের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর। বিবাহের সংবাদে জেন্‌কিন্‌স্ ক্রুদ্ধ হইয়া রামরঞ্জনকে কলিকাতায় পাঠাইতে আদেশ দিলেন এবং মহানন্দ চৌধুরীকে পদচ্যুত করিয়া বর্দ্ধমান জেলার দেবীপুর ধামসা নিবাসী দুর্গাদাস বসুকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। পিতামহী মন্দাকিণী দেবী রামরঞ্জনকে লইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামরঞ্জনকে না পাইয়া জেন্‌কিন্‌স্ কৃষ্ণচন্দ্রের বহু অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিয়া হেতমপুরের ঘরদুয়ার তালাবন্ধ করার হুকুম দেন। প্রতিবাদে ম্যানেজার দুর্গাদাস পদত্যাগ করেন। হেতমপুরের উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই জেন্‌কিন্‌স্ বদলী হইয়া গেলেন। আসিলেন লিউস্ সাহেব। কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার হইয়া আসিলেন হিউম স্মিথ। সহকারী তাঁর ধরণীধর রায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে রামরঞ্জন নওাগ্রামে বিজয় গোবিন্দ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কিন্তু তিনি রামরঞ্জনকে কোর্টে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দিয়া হেতমপুরে লইয়া আসিলেন এবং মন্দাকিণী দেবীকেও সম্মত করাইলেন। রামরঞ্জন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন তাঁহাকে কাশীতে পাঠানো হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বীরভূমে হাজির হইতে নির্দ্দেশ দিলেন। বীরভূম হইতে রামরঞ্জন কলিকাতায় গিয়া ছয়মাস কাল থাকিয়া ১২৭২ সালে কাশীতে যান এবং সেখানে কেদারনাথ পালধীর তত্ত্বাবধানে থাকেন।

১২৭৬ সালে রামরঞ্জন সাবালক হন। ১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে কোর্ট অব ওয়ার্ড আশী হাজার টাকা দেনা শোধ করিয়া দুই লক্ষ টাকা জমা সহ সমস্ত সম্পত্তি রামরঞ্জনকে প্রত্যর্পণ করেন। ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ ইং জুলাই মাসে) মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

১২৮২ সালে রামরঞ্জন "রাজা" উপাধি পান। ১২৮৪তে হন "রাজাবাহাদুর"।

১৩০৩ সালে (ইংরাজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) রামরঞ্জনের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী রাণী পদ্মসুন্দরী কর্তৃক তদীয়া শ্বশুর কৃষ্ণচন্দ্রের নামে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে হেতমপুরের রাজাবাহাদুর রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী উপাধি পাইলেন "মহারাজা"। মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী। লহ নমস্কার।

হীরক জয়ন্তী উৎসবের

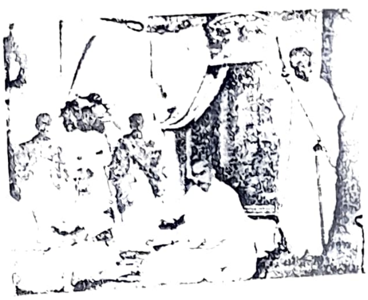
বিভিন্ন দৃশ্য



পতাকা উত্তোলন



ডাঃ ডি. এন. সেন কর্তৃক উদ্বোধনী ভাষণ





আলোক চিত্র—

হীরক জয়ন্তী উৎসবের

বিভিন্ন দৃশ্য

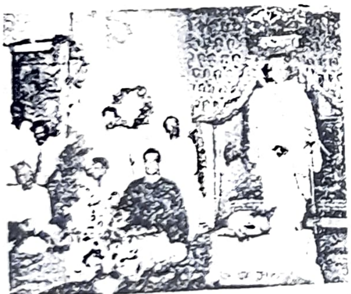


ডাঃ ডি. এম. সেন কর্তৃক বি. এন্. সি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

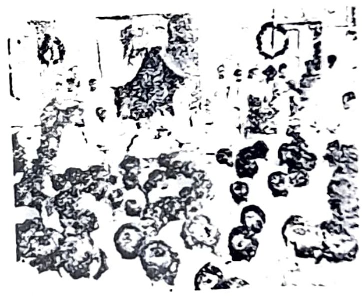


অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ

(বাম হইতে) শ্রীভি. এন্. সি. বোনার্জি, আই. এ. এস. কলেজ পরিচালক সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ডি. এম. সেন, এম. এ, পি-এইচ. ডি, শিক্ষা সচিব, কুমার [illegible]রঞ্জন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ শ্রী[illegible] গোবিন্দ মজুমদার।



প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের ভাষণ



হীরক জয়ন্তী উৎসব মঞ্চের দৃশ্য

আলোক চিত্র—শ্রীঅনন্ত সেনগুপ্ত, কলিকাতা [illegible]

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ পত্রিকা

১৯৫৮	হীরক জয়ন্তী সংখ্যা	এপ্রিল

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ হীরক জয়ন্তী

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

তব আকাঙ্ক্ষার বীজ আজি বনস্পতি
ফলে পুষ্পে সুবিশাল অতি।
করেছে শ্যামায়মান এ উষর ভূমি
মহালক্ষ্মি—প্রসীদতু তুমি।
এ তব অমৃত সরে নিত্য নব পদ্মের উদ্ভব,
কমলের অনন্ত উৎসব।
অফুরন্ত পূজা আর অফুরন্ত সাধকের সারি
ধন্য তুমি হে পদ্ম কুমারী।
তোমার এ রাজসূয় চিরদিবসের
পুণ্য ও অনিন্দ্য আনন্দের।
শতাব্দী যেতেছে—কত শতাব্দীই যাবে
তব কীর্ত্তি নব শক্তি পাবে।
মহত্তর বৃহত্তর হবে সে প্রোজ্জ্বল
মহিমায় ও সহস্রদল।
ভিত পাতে গুণী গুরু, ছাত্রগণ পুত্র প্রতিভার
অনাগত নব নালন্দার।
ভাব তব প্রতিষ্ঠানে হল রূপায়িত
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী প্রীত।
তোমার কিরীটে কত সমুজ্জ্বল হীরা
দিয়ে যাবে ভাবী শতাব্দীরা।

যুগ ধর্ম্ম

শ্রীঅনিলবরণ রায়
(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেরী)

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের হীরক-জয়ন্তী হইতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষে উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। সেজন্য প্রথমেই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। হেতমপুর কলেজে আমি ১৯১৩ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত সাত বৎসর অধ্যাপনা করি—আমি পরে যে অধ্যাত্মসাধনার জীবন গ্রহণ করিয়াছি তাহার ভিত্তিটি হেতমপুরেই গঠিত হইয়াছিল। আমি যখন হেতমপুরে অধ্যাপনা আরম্ভ করি তখন আমার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। একবার ডাঃ পি, কে, রায় কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাকে কলেজের একজন ছাত্র বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্যান্য যুবকের ন্যায় ইংরাজীশিক্ষার ফলে আমারও হইয়াছিল western mentality, পাশ্চাত্য মনোভাব। ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম হইলেও এবং বাল্যকাল ধর্ম্মীয় আবহাওয়ার মধ্যে কাটিলেও কুশিক্ষার ফলে আমিও প্রায় নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলাম। হেতমপুরের রাজপরিবারে অনেক ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা ছিল, সম্ভবতঃ এখনও আছে—কিন্তু সে সব আমার উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—ঐ সব গতানুগতিক অনুষ্ঠান এবং বাহ্য আড়ম্বর আমার মোটেই ভাল লাগিত না। একবার শুনিলাম মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনের নিমন্ত্রণে এক বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া হেতমপুরে আসিতেছেন—নাম রামদাস বাবাজী। তিনি নাকি challenge করিয়াছেন যে কেহ তাঁহার কীর্ত্তন শুনিবে তাঁহাকেই কাঁদিতে হইবে। আমরা তো ইহা উপহাস করিয়াই উড়াইয়া দিলাম। অপরাহ্ণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বন্ধুবর গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্রকে আমি বলিলাম, "কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে চোখের জলে বক্ষ প্লাবিত করিবে, সেখানে আমাদের চোখ শুকনো রাখা ভাল দেখাবে না—আমি বরং একটা কাঁচালঙ্কা পকেটে করে নিয়ে যাব, সময়মত একটু চোখে ঘসে দিলেই হবে।" আমার এই বক্তব্য গ্রামে রটিয়া গিয়া বেশ কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু আমি যেটা একেবারে অসম্ভব ভাবিয়াছিলাম তাহাই শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল—রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে এক সময়ে আমার ভিতর এমন ভাবের উদয় হইল যে বাস্তবিকই আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। আজ হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে যে কথাটি বলিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি, তাহারই ভূমিকাস্বরূপ আমার ব্যক্তিগত কথা কিছু বলিলাম—আশা করি ইহাতে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমাদের স্কুল কলেজে আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—তাহা কি ঠিক হইতেছে? এই প্রশ্নটি আমি সকলকে অনুধাবন করিতে বলি; ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি উপাখ্যান আছে, নারদ সনৎকুমার ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"ভগবান, আমি বেদ, পুরাণ, ছন্দ, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আমি শান্তি পাইতেছি না, আমার

হৃদয় শোকদুঃখে পূর্ণ—কিসে আমি এই নিদারুণ শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাই আমাকে বলিয়া দিন—সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা

ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বোতি

(ছাঃ ৭।১।২-৩)

বর্তমানে আমাদের উচ্চতম স্তরে কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় নারদ সে সব আয়ত্ত করিয়াও দুঃখ-সাগর পার হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই শিক্ষার ফলে কি লাভ হয়? যাহারা খুবই ভাগ্যবান এই শিক্ষার ফলে তাহারা উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, অধ্যাপক, হয়ত বা ভারত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনকুবের হইতে পারেন—কিন্তু তাহাতে কি জীবন ও জন্ম সার্থক হইবে? প্রকৃত সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দের সন্ধান মিলিবে? যত বড় লোকই হউন না কেন, মানুষের যে সাধারণ জীবন তাহা অতিশয় নীরস ও নিরানন্দময়—এই নীরসতা দূর করিবার জন্য মানুষ কতই না ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া আরও নীচে নামিয়া যায়!

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু দুর্লভ ভোগ্য বস্তু আছে, যথেচ্ছা তাহা প্রার্থনা কর। এই যে রথারূঢ়া বাদ্যযন্ত্র হাতে আনন্দদায়িনী রমণীসকল রহিয়াছে,—মৎপ্রদত্ত ইহাদিগকে তোমার ইচ্ছানুরূপ সেবায় নিযুক্ত কর—কিন্তু অমৃতত্বের রহস্য জানিতে চাহিও না।" বালক নচিকেতা উত্তর দিল—"হে যমরাজ! তুমি যে সকল ভোগ্যবস্তুর কথা বলিলে, তাহা কাল পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। অধিকন্তু ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়শক্তি হরণ করে; ইহারা ক্ষণস্থায়ী। অতএব, রথ এবং নৃত্যগীতাদি তোমারই থাকুক। মানুষ কখনও ঐশ্বর্য্যভোগে তৃপ্ত হইতে পারে না। যাহাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি সেই শিক্ষা আমাকে দাও।" ইহাই ভারতের শাশ্বত মর্ম্মবাণী।—ভারতের নারী মৈত্রেয়ীর মুখেও এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্?" (ধনরত্নাদি) যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব না লাভ করিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

আজ আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও নচিকেতা বা মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ শুনা যাইতেছে কি? সেও বেশী দিনের কথা নয়, এই বাংলাদেশেই রাম-প্রসাদ গাহিলেন—

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমী রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোণা।

আমাদের স্কুল কলেজে মানবজমীর আবাদ ঠিক মত হইতেছে কি? সোণার ফসল ফলিতেছে কি? না শুধুই আগাছা আর কাঁটা!

মানবজমীতে সোণার ফসল ফলিতে পারে, ফলাইতে হইবে—ইহাকেই অরবিন্দ বলিয়াছে, 'Life Divine,' দিব্য জীবন। ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য—বাল্য হইতে এই লক্ষ্য যদি আমাদের বালক বালিকাকে অনুপ্রাণিত করা না হয় তাহা হইলে নিজেদের জীবনে বা সমাজে ও দেশের জীবনে সোণার ফসল ফলাইতে পারিবে না শুধু কাঁটাই লাভ করিবে—

ফলের জন্য গাছ পুতলাম
পেলাম কেবল কাঁটা।

অমৃত কি? দুঃখলেশহীন, স্থায়ী শান্তিময়, প্রেমময়, আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, দিব্যজীবন—ভারত যাবহমান কাল হইতে ইহার জন্যই সাধনা করিয়াছে, প্রস্তুত হইয়াছে—আজ সেই ফসল ফলাইবার দিন আসিয়াছে—তাহার উপযোগী কৃষিকাজ শিখাইতে

না পারিলে আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাই ব্যর্থ হইবে,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অভীপ্সা আমরা পূর্ণ করিতে পারিব না, জগৎ যে ভারতের ঐতিহ্যের দিকে বড় আশায় চাহিয়া রহিয়াছে, জগৎবাসীর সে আশাও আমরা পূর্ণ করিতে পারিব না।

A thousand ills assail the mortal's hours
And wear away the natural joy of life.

— Savitri

এই ক্ষুদ্র সুখদুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ মর্ত্ত্যজীবনে মানুষ এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, অমৃতময় বা দিব্যজীবনের কল্পনা করাও তাহার পক্ষে কঠিন। রাধার সখিরা রাধাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার যে প্রেম, তাতে তোমার কি সব অনুভূতি হয়, আমাদের একটু বলবে?" রাধা উত্তর দিল, "সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়, সে যে তিলে তিলে নূতন হোয়।"—ইহাই দিব্য জীবনের স্বরূপ, তাহার আনন্দ কখনও ফুরায় না, একঘেয়ে হইয়া পড়ে না, তিলে তিলে নূতন হয়।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'constant miracle!' এই দিব্যজীবন লাভের জন্য আমাদিগকে কোথাও যাইতে হইবে না—ইহার উৎস আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে—সেই উৎসের সহিত আমাদের বাহ্য জীবনের সংযোগ নাই—তাই এই সাধারণ জীবন এত নীরস, নিরানন্দময়, কণ্টকাকীর্ণ। সেই উৎস হইতেছে আত্মা—সচ্চিদানন্দ—তাহা আমাদেরই মূল সত্তা। একবার কোনরকমে এই আত্মার সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিলেই আমাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে—ইহারই উপায় যোগসাধন। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মানবের প্রতিভূস্বরূপ অর্জুনকে তাহার সকল সমস্যার চরম সমাধানের জন্য বলিলেন,—তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন—"অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।"

এই যোগতত্ত্ব বর্ণনা করিবার স্থান এখানে নাই তবু সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথমেই চাই ভগবানে বিশ্বাস এবং ভগবান সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা। বিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাতে আর কোনই বাধা নাই, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জড়বিজ্ঞান আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মত বলে না, যে Gravitation, Evolution প্রভৃতি কয়েকটি থিওরীর দ্বারাই জগতের সব কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায়, একজন চৈতন্যময় সৃষ্টিকর্তা ভগবানের অস্তিত্ব মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই—উহা আদিম মানব-মনের একটা অজ্ঞান কুসংস্কার মাত্র। আজ বিজ্ঞান নিউটনের ভাষাতেই বিশ্বের অসীম রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—

দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন,

A conscious power has drawn the plan of life,
There is a meaning in each curve and line.

—Savitri

গীতা বলিয়াছে, ভগবান সকলেরই সুহৃদ, বন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ছিলেন অর্জুনের সখা ঠিক তেমনিই। এই চিরসখা শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়রথে বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার দিকে যে ফিরিবে, সে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার দর্শন, তাঁহার সখ্য, তাঁহার নির্ভরশীল প্রেমস্পর্শ প্রার্থনা করিবে সে নিশ্চয়ই পাইবে, বহু মহাপুরুষ নিজেদের জীবনে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

ইহার জন্য মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় যাইতে হইবে না, যজ্ঞানুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতার দিকে

দীর্ঘ তীর্থযাত্রা করিতে হইবে না প্রত্যহ কোন স্থানে বসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে একটা ফুল, একটা পাতা, একটু ভক্তি দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন এবং সেই সূত্রেই ক্রমশঃ আমাদের জীবনকে তাঁহার নিজের জীবনের মধ্যে তুলিয়া লইবেন। এই সহজ সাধনাটুকু মানুষ কেন করে না, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! এইরূপ আন্তরিক পূজার ফল হইবে এই যে, মানুষ তাহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম্মকে ঐরূপ ফুল বা পাতার ন্যায় ভগবানে অর্পণ করিতে শিখিবে—অর্থাৎ সকল কাজই এমন ভাব লইয়া করিবে যেন ঐটির দ্বারাই ভগবানের পূজা, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হইতেছে। ইহাই গীতার সাধনা।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৯।২৭

তবে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশে যে সব কাজ করা হয় সে সবকে ভগবানের কাজ মনে করা সহজ নহে, আত্মপ্রতারণা আসিয়া পড়ে তাই নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতের জন্য কিছু কাজ, কিছু দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর ফীশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।" আজ দেশের বড় দুর্দ্দশা। সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। যে কেহ নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞহিসাবে লোকহিতের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একটি টাকা চাঁদা দিতে অথবা সপ্তাহে অন্ততঃ একঘন্টা কাজ করিয়া দিতে সম্মত হইবেন তাহাকেই সঙ্ঘের সভ্য করা চলিবে। স্থানীয় সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতেই একটি পরিচালক কমিটি গঠন করিবেন। ঐ কমিটি স্থানীয় প্রয়োজন ও অবস্থানুযায়ী সকল প্রকার লোকহিতকর কাজের ব্যবস্থা করিবেন গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মে বৃথা সময় ও অর্থ নষ্ট না করিয়া সর্ব্বত্র এইরূপ সেবক সঙ্ঘ গঠিত হউক তাহাই হইবে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপ।

হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিয়া এইরূপ একটি আদর্শ সেবক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলুন। তাহাদের একটি কাজ হইবে নিরক্ষরতা দূর করা। "রাশিয়ার চিঠিতে"তে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "ভারতের বুকে আজ যা কিছু বাধা তাহার মূলে হইল অশিক্ষা। সোবিয়েৎ আজ শিক্ষার ফলে রথের বেগে আগাইয়া চলিয়াছে।" গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর পর্যান্ত সকল ছেলেমেয়েকে মাতৃভাষাটা ভাল করিয়া শিখাইয়া দেওয়া হউক এবং সেই সঙ্গে কিছু Arithmetic, আর ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষাটা ভাল করিয়া শিখাইয়া দেওয়া। ব্যস্—তাহার পর পাঠাগার ও পুস্তকালয় থাকিবে, ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া লইতে পারিবে। নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য স্কুল কলেজের বড় বড় বাড়ী ও সরঞ্জাম এবং বেতনভোগী বহু শিক্ষক শিক্ষিকার আবশ্যকতা নাই সঙ্ঘের সভ্যরাই Night School, Sunday School, Tutorial Class ইত্যাদি দ্বারা এই ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন in a missionary spirit' আর এই পথে চেষ্টা না করিলে প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য্য সার্ব্বজনীন শিক্ষা চিরকাল আকাশকুসুমই হইয়া থাকিবে।

University Commission-এর প্রস্তাব অনুযায়ী হেতমপুর কলেজকে কেন্দ্র করিয়া যদি

একটি Rural University গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে দেশে গঠনমূলক কাজের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করা হইবে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি কৃষি কলেজ থাকিবে সেখানে আধুনিক প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা চলিবে এবং চারিদিকে গ্রামের কৃষকগণকেও উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে সাহায্য করা হইবে। এখানে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে এইরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

এই সব কাজই করিতে হইবে যোগসাধনার অঙ্গরূপে, গীতার কর্ম্মযোগরূপে। সেই সঙ্গেই চাই কাম, ক্রোধ ও লোভ, মানুষের এই তিনটি প্রধান শত্রুকে জয় করিতে অভ্যাস করা—অর্থাৎ ইহাদের উত্তেজনা আসিলে তাহার বশে কোন কাজ করিবে না, পরন্তু ধীর স্থির ভাবে বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে তাহাই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে করিতে হইবে।

আমি এখানে যে অধ্যাত্মসাধনার সূত্র দিলাম তাহা শিক্ষা দিতে আমাদের Secular গবর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রে কোনই বাধা নাই। ইহা হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টান, কোন মতবাদের শিক্ষা নহে সকল ধর্ম্মেই যাহা স্বীকৃত, সকল ধর্ম্মেরই যাহা মূল কথা তাহাই এখানে গৃহীত হইয়াছে, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। এই শিক্ষা দিবার জন্য religious class খুলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকগণ যদি নিজেদের জীবনে এই সাধনা অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের দৃষ্টান্ত ও ব্যক্তিগত উপদেশের দ্বারা ছাত্রছাত্রীগণকে এই সাধনায় অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন নতুবা শিক্ষাদানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি
(কলেজ সমূহের পরিদর্শক, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা)

আমি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হই। সে সময় সিউড়ীতে কোন কলেজ ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বভারতীও তখন কলেজী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। বীরভূম জেলার একমাত্র কলেজ ছিল হেতমপুর। ছোট্ট ছবির মতন এক সুন্দর প্রাসাদ। আর সব মাটির ঘর। রাজবাড়ীর লোক ছাড়া অন্য কাহারও পাকা দালানে বাস করিবার অধিকার ছিল না। রাজারা সাধারণ প্রজাদিগকে ইটের বাড়ী তৈয়ারী করিতে দিতেন না, কেননা তাহাতে তাহাদের কায়েমী অধিকার জন্মিতে পারে এবং রাজাদের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। গ্রামে মধ্যবিত্ত লোক ছিল খুব কমই। রাজাদের কর্ম্মচারী, পুরোহিত, আশ্রিত ব্যক্তিরা গ্রামে বসবাস করিতেন ; গ্রামে ও তাহার আশেপাশে অনেক বাউড়ী, বাগদী, সাঁওতাল বাস করিত। কালো-কালো চেহারা, স্বাস্থ্যের দীপ্তি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গা দিয়া যেন তেল চুয়াইতেছে। পরনে তাদের মলিন বস্ত্রখণ্ড, কিন্তু মুখে সন্তোষের মধুর হাসি। মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পথ চলে। মানসরোবর হইতে সোজা মহারাজ মহিমানিরঞ্জনের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় আধ মাইল জমিতে রাস্তার দুই পাশে ঘন শালবন। দিনের বেলাতে ওই শালবনের মধ্যে যেন এক রোমাঞ্চকর রহস্য ঘনীভূত হইয়া থাকিত।

গ্রামের আবহাওয়াতে আমি মানুষ। কলিকাতায় এম্-এ, পড়িবার সময় আমার অবস্থা হইয়াছিল জল ছাড়া মাছের মতন। হেতমপুরের স্নিগ্ধ পরিবেশে আসিয়া আমি অসীম শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম। ক্ষীণকায় গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়াছে, ছোট্টখাট্টো মানুষটিকে দেখিয়া অনেকেই আমাকে পড়ুয়া বলিয়া ভ্রম করিত। প্রথমে আসিয়া গিড়িডাঙ্গা* হোষ্টেলে উঠিলাম। একজন মাতব্বর ছাত্র থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। সে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এসো এসো, কোন্ ইয়ার?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইয়ারের লোভেই আসা, দেখি কোন্ ইয়ার জোটে? সে একেবারে গদগদ হইয়া কহিল, "খাসা, তামাক চলে?" আমি মাথা ঝাঁকাইয়া "না" বলায় সে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী করিল, "এখন চলে না বটে, কিন্তু এখানে থাকতে হলে চলবেই।" পরের দিন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশে ঢুকিতেই ওই ছাত্রটি বিস্ফারিত নয়নে আমার পানে চাহিয়াই সেই যে অন্তর্দ্ধান করিল, তাহার পর আর তাহাকে কোন দিন কলেজে বা হোষ্টেলে দেখিতে পাই নাই। পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম যে, সে সোজা কলেজ হইতে

* বর্ত্তমানে এই হোষ্টেলটি কলেজের হাতে নাই। এই স্থানে এক টি-বি নিরাময় হইয়াছে. কলিকাতার "নিরাময়" সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। (সঃ হী-জ-স)

দুবরাজপুর ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেন ধরিয়াছিল এবং পরে লোক মারফৎ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল।

এখনকার দিনে বিশেষ করিয়া সহর বাজারে ছাত্রদের মধ্যে এরকম লজ্জা পাওয়াকে বেকুবি বলিয়া উপহাস করা হয়। কিন্তু ৩৪ বৎসর আগে হেতমপুরের ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপকের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও গুরু শুশ্রূষার ভাব ছিল। ছাত্রেরা অধ্যাপকের কোন ব্যক্তিগত কাজ করিয়া দিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিত। আমি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমার ছোট তিন ভাই, স্ত্রী ও ছয় মাসের পুত্রকে হেতমপুরে লইয়া আসি। নূতন সংসার পাতিতে হইবে, নূতন জায়গা এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতাও আমাদের কাহারও ছিল না। ছাত্রেরাই উদ্যোগী হইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে বসিল। কেহ বাজার হইতে কয়লা আনিয়া দিল, কেহ চাল ডাল তরকারী আনিল, কেহ জল তুলিয়া দিল। চাকরটি ঘর ঝাড়ু দিতে দেরী করিতেছে দেখিয়া একজন ছাত্র নিজেই হাতে ঝাঁটা তুলিয়া লইল, অপর একজন উনানে আঁচ দিয়া দিল। আমরা বৈকাল ৫টা আন্দাজ সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। ছাত্রদের সহায়তায় সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে আমাদের ঘর-সংসার পাতা হইল ও উনানে রান্না চড়িল।

এই সহায়তা যে কেবল একদিন পাইয়াছিলাম তাহা নহে। প্রায় প্রত্যহই ছেলেরা আসিয়া নানা-ভাবে আমাদের সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। বৈকাল বেলাতে আমার পুত্রকে তাহারাই কোলে করিয়া রাখিত। তাহাকে কোলে লইবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া থাকিত। আমিও শালবাগানের আলোছায়ায় বসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতাম। হেতমপুরে খুব ভাল মুড়ি পাওয়া যাইত। তাহাই তেল নুন দিয়া মাখিয়া আমরা বৈকালে জলখাবার খাইতাম। দুই পয়সার মুড়িতে ৭।৮টি ছাত্র সহ আমার পরিতৃপ্তি সহ জলখাবার হইত। মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে দেশ বিদেশের ইতিহাসের গল্প ছাত্রদের মনোরম লাগিত। তাহারা ইতিহাসের মধ্যে রসের সন্ধান পাইল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে অনেকেই লাইব্রেরী হইতে ইতিহাসের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ঘরে যাহা পড়িত বেড়াইতে আসিয়া তাহা লইয়া প্রশ্ন করিত, তর্ক করিত, আলোচনা করিত। আলোচনার মীমাংসার জন্য আমাদের নূতন নূতন বইয়ের প্রয়োজন হইত; কিন্তু বই পাওয়া সহজ ব্যাপার হইত না।

পাড়াগাঁয়ের কলেজ। ছোট্ট তাহার লাইব্রেরী। আয় তাহার সুনির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কয়েক স্থানের জমিদারী খাজনা হইতে কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ফসল কাটার পর প্রজারা খাজনা দিত। সুতরাং বছরে দুইবার খাজনা উসুল হইত। এ সময় আমাদের বেতনের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইত। বাকি দশ মাস আমরা দশ বিশ টাকার বেশী পাইতাম না। ছাত্ররা নিয়ম মত ফিস্ জমা দিত না। কোন দিন কোন ছাত্র ফিস্ দিলে বা ভর্ত্তি হইলে সেই টাকা যাহার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহাকে দেওয়া হইত। ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত ও বাংলার এক একজন করিয়া অধ্যাপক ও একজন অধ্যক্ষ এই সাত জন হইয়া কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী।

গ্রামেরই এক জন ভদ্রলোক কলেজের কেরাণীর কাজ করিতেন। তিনি প্রত্যেকের চাহিদার খবর রাখিতেন। সুতরাং কাহার কোন্ দিন টাকার সবচেয়ে প্রয়োজন তাহা লইয়া কোন বাদবিতণ্ডা হইত না। হেতমপুরের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য

অবশ্য নগদ টাকার প্রয়োজন হইত কেবলমাত্র তরকারী কিনিবার জন্য, লোক-লৌকিকতা করার জন্য এবং স্থানান্তরে যাইবার জন্য বা চিঠিপত্র লেখার জন্য। গ্রামের এবং দুবরাজপুরের সকল দোকান-দারই অধ্যাপকদিগকে ধারে কাপড়, জামা, ঔষধ, সন্দেশ-মিষ্টান্ন, চাল ডাল তেল নুন বিক্রয় করিত। মাছওয়ালী রোজ বাড়ীতে মাছের রোজান্ দিয়া যাইত। মুড়িওয়ালী মুড়ি দিত। গ্রামে পোষ্টাফিস থাকিলেও ধারে খাম পোষ্টকার্ড কিনিতে পাওয়া যাইত না। রেল ষ্টেশনেও ধারে টিকিট মিলিত না। শাক, তরকারী বেচিবার হাট বসিত সপ্তাহে দুই দিন। হাটুরেরা অন্য গ্রাম হইতে আসিত, সেইজন্য নগদ দাম দিয়া উহা খরিদ করিতে হইত। মাসে ২।৩ টাকার তরকারী কিনিলে ৫।৬ জনের একটি ছোট্ট পরিবার সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইতে পারিত। একে তো জিনিষপত্র ছিল অসম্ভব রকমের সস্তা; তার উপর আলু, বড়ি, পোস্ত, খেরো ও ডাঁটা ছিল প্রধান খাদ্য। শীতের শেষে চালানি কপি পাওয়া যাইত। চার পাঁচ পয়সা দিয়া একটা বাঁধাকপি কিনিলে দুই তরকারী হইত। আলুর সের তিন পয়সা চার পয়সা ছিল।

আমরা যে দিন বেতন পাইতাম সেদিন গ্রামের জীবনে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইত। দুপুর বা বৈকাল নাগাদ বুঝা যাইত যে রাজবাড়ী হইতে কলেজের প্রাপ্য টাকা পাওয়া যাইবে কিনা। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর আমাদের টাকা গুণিয়া দেওয়া হইত। আমরা একটা মোটা চাদর লইয়া যাইতাম। তাহাতে ২।৫ মাসের বেতন নগদ রূপার টাকা বাঁধিয়া আনিতাম। তখন পাড়াগাঁয়ে নোটের প্রচলন বেশী হয় নাই। রায়তেরা রূপার টাকায় খাজনা দিত। সুতরাং আমাদিগকেও তাহাতেই বেতন লইতে হইত। বাড়ী ফিরিয়াই দেখিতাম সারবন্দী হইয়া মাছওয়ালী, মুড়িওয়ালী, ধোপা, গোয়ালা, মুদি, কাপড়ের দোকানদার প্রভৃতি বসিয়া আছে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই তাহাদের পাওনাগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া হালকা হইতাম।

গ্রামের সাদামাঠা জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলাম বলিয়া মাসিক একশত টাকা বেতন পাইলেও চৌদ্দমাস চাকুরীর মধ্যে চার পাঁচশত টাকা জমিয়া-ছিল অর্থাৎ কাজ ছাড়িয়া পাটনায় আসিবার সময় ওই টাকা হাতে পাইয়াছিলাম। হেতমপুর দুবরাজপুর, এমন কি সিউড়ী সহরেও তখন সিনেমা ছিল না। সুতরাং একটা মোটা খরচের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। দুইটি ভাইকে স্কুলে ও একটি ভাইকে বাড়ীতে পড়াইবার খরচ নির্ব্বাহ করিয়াও একশত টাকা বেতনে হাতে টাকা জমাটা আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়। যদি মাসের মাস নগদ বেতন পাইতাম তাহা হইলে হয়ত টাকা জমিত না। কেননা, আর কিছু না হউক বই কেনার বাতিক মিটাইতে টাকা খরচ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু হাতে নগদ টাকা না পাওয়ায় কলেজ লাইব্রেরীতে বই কেনার জন্য রাজা বাহাদুরের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হইত। একবার কলেজের কর্ত্তৃস্থানীয় একজন বিরক্ত হইয়া বলিয়া-ছিলেন "পুরা একশ' টাকা মাইনে দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্-এ-কে বহাল করলাম, আর সে কিনা বই পড়ে তবে ছেলেদের পড়াতে চায়! সেকালে আমাদের পণ্ডিতমশায়দের সব বই মুখস্থ থাকতো।" এরূপ বিদ্রূপ ও ভৎসনাতেও আমি দমিতাম না। একজনের কাছে না হইলে অন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যাইয়া বই কেনার জন্য আবদার ধরিতাম। মেজমহারাজ মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যোৎ-সাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বীরভূম অনুসন্ধান

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সাহায্যে কলেজ লাইব্রেরীতে অনেকগুলি ভাল ভাল বই কিনিয়াছিলাম।

তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হেতমপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লইয়া বাংলা দেশে খুব হৈ চৈ বাধিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল ধর্ম্মদাস দত্ত কখনও বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা পাশ করেন নাই; অন্য এক ধর্ম্মদাস দত্ত পাশ করিয়াছিলেন এবং ইনি তাঁহার ডিপ্লোমার ডুপ্লিকেট কপি জোগার করিয়া কাজ চালাইয়াছিলেন। এই কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইবার পর অবশ্য ভদ্রলোক অন্যত্র চলিয়া যান। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা চালান নাই। তিনি বি-এ পাশ না হইলেও ইংরাজীটা ভালই জানিতেন। বি-এ ক্লাশ পর্য্যন্ত বাইবেল পড়াইতেন। সে সময় বাইবেল পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। ছেলেরা তাঁহার অধ্যাপনায় কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। পড়ানো ছাড়া রাজবাড়ীর নানান্ রকম কাজে তিনি ইংরাজীতে মুসাবিদা করিয়া দিতেন। সেসব লেখাও বেশ নির্ভুল হইত। লোকহিসাবেও ধর্ম্মদাসবাবু খারাপ ছিলেন না। সকলের সঙ্গেই অমায়িক ভাবে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে খুব ভাল পান্তুয়া তৈয়ারী হইত। যখনই তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছি তখনই তিনি পান্তুয়া খাইতে দিতেন। তিনি কলেজের দোতলার এক অংশ লইয়া সপরিবারে বাস করিতেন। আমার বড় ছেলে ভক্তকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। প্রায়ই আমাদের কোল হইতে লইয়া তিনি তাহাকে খেলা দিতেন।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে এই দেখানো যে, সে সময়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা অধ্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি যথেষ্ট ছিল। ছাত্রদের মধ্যে discipline বা নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই উঠিত না। ছেলেরা কেহ কেহ যে মাঝে মাঝে দুষ্টামি না করিত তাহা নহে, কিন্তু বাপ বা বড় ভাই যেমন ছেলে বা ছোট ভাইকে স্নেহের সঙ্গে সাবধান করিয়া দেন আমরা সেইরূপ করিতাম। তাহাতে যথেষ্ট সুফল দেখা যাইত।

আজ পাড়াঁগায়ের ছোট কলেজেও সে-যুগের হেতমপুর কলেজের মতন আবহাওয়া দেখা যায় না। বহুদিন ধরিয়া রাজনীতিতে অসহযোগ ও আইন অমান্য করার ফলে আমাদের দেশের সামাজিক জীবনের সকল স্তরে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। ছেলেরা পাশ করিয়াও ভাল কাজ-কর্ম্ম পায় না বলিয়া পড়াশুনা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর তাহারা শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। শিক্ষকেরাও আজকাল আর ছাত্রদের সঙ্গে সেকালের মতন একপ্রাণতা অনুভব করেন না। এই সকল কারণে এখনকার দিনে কলেজ জীবন আর সেকালের মতন নাই।

পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

কোন কিছু দেখিতে অথবা জানিতে হইলে একটি অধিষ্ঠান ভূমি স্থির করিয়া লইতে হয়। ভূগোল পড়িয়া হেতমপুরের কথা জনা যায়। পায়ে হাঁটিয়া চারিদিক ঘুরিয়া হেতমপুর দেখা যায়। উড়ো জাহাজে উপরে উঠিয়াও হেতমপুর দেখিয়া লইতে পারি। সকলের দৃষ্টিভঙ্গী একরকম নহে। এক একজন মানুষের এক এক রকম রুচি। দেশভেদে, কালভেদে, শিক্ষা, প্রতিবেশ প্রভাব এবং সংস্কারভেদে এক এক রকমের রুচি গড়িয়া উঠে। রুচিভেদে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে। মানুষ রুচি অনুসারে অধিষ্ঠান ভূমি স্থির করিয়া লয়।

পদাবলী বলিতে আমরা বৈষ্ণব পদাবলী বুঝিয়া থাকি। পদাবলী শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্যরসের গান; প্রধানত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাগান। কীর্ত্তনীয়াগণ আজিও এই পদাবলী গান করেন। ইহার অপর নাম মহাজন পদাবলী। অনেকে বলেন কীর্ত্তন পদাবলী। আধুনিক পণ্ডিতগণ যাহাকে গীতিকবিতা বলেন, পদাবলীর সঙ্গে তাহার মিল পাওয়া যায়। রসমাধুর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে, ছন্দসৌন্দর্য্যে, ভাষার ঐশ্বর্য্যে এবং অলঙ্কার প্রাচুর্য্যে পদাবলীর কতক-গুলি কবিতা পৃথিবীর যে কোন উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার সাহিত্যভূমি ভিন্ন অপর একটি অধিষ্ঠানভূমি আছে।

আজি হইতে চারিশত বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় একটি অঘটন ঘটিয়াছিল। এমনই এক ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা সন্ধ্যায় বাঙ্গালার নবদ্বীপে মানব-প্রেম, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। দেশের সে এক ভীষণ দুর্দ্দিন। মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, মানুষকে যাহা ধরিয়া রাখে, সেই ধর্ম্মই বিপন্ন হইয়াছিল। হিন্দুজাতির অস্তিত্বই লোপ পাইতে বসিয়াছিল। বাঙ্গালা সেদিন তুর্কীর অধিকারে তাহাদের অনেকেই ধর্ম্মপ্রচারের নামে ছলে বলে কৌশলে লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিত। এ দেশের কেহ কেহ স্বেচ্ছাতেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত। চাকুরী, জায়গীর, মর্য্যাদা, নগদ টাকা, পরাধীন জাতির পক্ষে রাজধর্ম্ম গ্রহণের প্রলোভনও বড় কম ছিল না। সমাজপতিগণ প্রমাদ গণিলেন। সেই সর্ব্বগ্রাসী বন্যার মুখে কূল কিনারা না পাইয়া তাঁহারা রাজার জাতির সঙ্গে একধরণের অসহযোগ অবলম্বন করিলেন। আচারের বেড়া দিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার নিয়মের গণ্ডীটা এমনই মারাত্মক ছিল, পান হইতে চূণ খসিলেই লোকের জাতি যাইত। কাহাকেও জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, অমনি আর তাহার সমাজে স্থান হইল না। এমন কি তুর্কীদের রান্নার গন্ধ নাকে গেলেও এ-দেশের লোকের জাতিচ্যুতি ঘটিত। এক কথায় বর্জ্জন ছিল, গ্রহণ ছিল না। ফলে সমগ্র হিন্দু জাতিটারই ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিল। সেই দুর্দ্দিনে, সেই অমানিশার ঘোর অন্ধকার রাত্রিতেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুদয়। নবদ্বীপে পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে, জননী শ্রীশচীদেবীর দুলালরূপে প্রেম ও করুণা বিগ্রহ গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব মানবপ্রেম তথা ভগবৎ প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তিনি প্রচার করিলেন শ্রীভগবানই

সংসারে একমাত্র সত্য, এবং তিনিই মানুষের একান্ত আপনার জন, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম। আচার্য্যগণ বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলনপূর্ব্বক এই বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেন। অনুধাবন করিলেন স্বধর্ম্ম সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও তাহারই মাধ্যমে শ্রীভগবানকে জানা যায়। পরধর্ম্ম ভয়াবহ; পরধর্ম্ম গ্রহণে সমাজ উৎখাত হয় এবং জাতি ধ্বংস হইয়া যায়। ধর্ম্মের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। বংশের উত্তরাধিকার প্রভৃতি যে সমস্ত বিধিবিধানে সমাজ-দেহ সুগঠিত, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যতিক্রমে সমাজের অঙ্গহানি ঘটে। সুতরাং সমাজের আনুগত্য প্রত্যেক মানুষকেই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা প্রত্যবায় ঘটিবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচার করিলেন, "স্বধর্ম্ম আচরণে শ্রীভগবানকে জানা যায়। তাঁহাকে পাওয়ার পথের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে শ্রীভগবানকে সম্বন্ধের বন্ধনে বন্দী করা যায় না। তাঁহাকে একান্ত রূপে পাওয়া যায় না।" এই কথাগুলি কিছু বিস্তৃতরূপে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

যে ধর্ম্ম কি তাহা জানে না, যে ধর্ম্মের আচরণ করিল না, সে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? যাহার কিছুমাত্র সম্বল নাই, সে কি ত্যাগ করিবে? সুতরাং সমাজে স্বধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। পরধর্ম্ম গ্রহণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের পন্থা নহে। উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মুক্তি নাই। স্বাধীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নহে। মুক্তি হইতে হইলে স্ব-অধীন হইতে হইবে। সমাজ, জাতি তথা মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। যে স্বাধীন সেই আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারে; সমাজ, জাতি, মানুষ তথা শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে পারে। ভালবাসায় স্বার্থগন্ধ থাকিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না।

স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসার উদাহরণ দিতে গিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোপরাজ নন্দ এবং গোপরাজ্ঞী যশোমতী, ব্রজরাখালগণ এবং ব্রজ-কিশোরীগণ কেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া-ছিলেন, শ্রীমহাপ্রভু সেই ভাববাণীই প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে সেই ভালবাসার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী এই ভালবাসার সিদ্ধমন্ত্র এবং শ্রীমহাপ্রভু সেই মন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি। সুতরাং আমাদিগকে পদাবলীর মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে গিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সামীপ্যই অধিষ্ঠান-ভূমিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর জীবনভাষ্য দিয়াই আমাদিগকে পদাবলীর অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভ্যুদয় না হইলে বাঙালী জাতি বাঁচিত না। বাঙালী জাতির পুনরুজ্জীবন উপলক্ষ্যে তিনি যে প্রাণপ্রদ সঞ্জীবন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রই পদাবলী। সেই মন্ত্রের মধ্যেই বিশ্বের নরনারীর নবজীবন লাভের অর্থাৎ এই জনমেই জনমান্তর প্রাপ্তির রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বাঙালী এই মন্ত্রের উদ্গাতা। বাঙালীকেই এই মন্ত্র প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি আচরণ করিয়া বাঙালীকেই এই মন্ত্রের সাধনের সঙ্কেত শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙালীর ইহাই বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়তি।

রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিকতা

ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, ফিল্
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
[লেখক এই কলেজের প্রাক্তন-ছাত্র]

সৌন্দর্য্যের পূজা যদি রোমান্টিক কবি মানসের পরিচায়ক হয়, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত রোমান্টিকধর্মী, বাস্তবকে ত্যাগ করে কল্পনার আকাশে উড়ে চলা যদি রোমান্টিসিজিমের লক্ষণ হয়, তা'হলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ অতি-রোমান্টিক। মনের সৃজনী ও গ্রহণী বৃত্তিতে যে অনির্দ্দেশ্য ইষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা আছে তা'কে ইমোশনের মধ্যে দিয়ে লাভ করার চেষ্টাই হচ্ছে রোমান্টিসিজম। কবিগুরুর মনের সৃজনী বৃত্তিতে যে আদর্শ ছিল তাকে সর্বদাই ইমোশনের মধ্য দিয়েই তিনি লাভ করতে চেয়েছেন ; অবশ্য কবি-আরাধ্যা সেই মানসী সুন্দরী চিরদিনই কবির অপ্রাপ্যা রয়ে গেছেন। 'সিন্ধুতীরে' কবিতায় কবি বলেছেন,

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি
চিরদিনই মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।

এই হচ্ছে রোমান্টিকতার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাস্তবতার স্থান নেই, প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-দারিদ্রের প্রবেশ নেই ; তা যেন ধরার ধূলিকে ত্যাগ করে আকাশ বিহারিণী হ'য়ে উঠেছে। এইজন্য যখন রবীন্দ্রকাব্য আমরা পাঠ করি, তখন কবিগুরুর অলোকসামান্য প্রতিভা আমাদিকে যতই বিস্মিত করুক না কেন, তার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুঁজে পাই না, মনে হয় তাঁর কবিতায় যে কথা বলা হয়েছে তা যেন আমাদের ঘরের কথা নয়,—যে অনুভূতি রূপ পেয়েছে তা যেন আমাদের অনুভূতি নয়। রবীন্দ্রনাথ কল্পনার প্রভাব অতিক্রম করে বাস্তবতার রাজ্যে অবতরণ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে কবিতা 'সর্বত্রগামী' হচ্ছে না। 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলছেন :—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে—
হে কল্পনে রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ; ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়
বিজনবিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে আর।"

অবশ্য রঙ্গময়ী কল্পনা তাঁকে নিষ্কৃতি দেয় নি। তাই রবীন্দ্রকাব্য কল্পলোকের উপকরণ উপহার দিলেও জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধির উপাদান পরিবেশন করতে পারে নি। কল্পনা প্রকৃতির মর্মমূলে প্রবেশের দ্বার কবিকে দেখিয়েছিল, কিন্তু মানুষের অন্তর্লোকে প্রবেশের পথ দেখাতে পারেনি এবং এইজন্যই সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য ও আনন্দ-বেদনার রূপায়ণ হিসাবে তাঁর কাব্য গড়ে ওঠে নি। 'ঐকতান' কবিতাটিতে কবির এ সম্বন্ধে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা,
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

* * * *

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি
থাকি তারি খোঁজে
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে সাধনা রূপ পেয়েছে, তা হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরকালের সাধনা। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন নদীও তার গতিপথকে বারবার পরিবর্ত্তিত করেছে কাজেই রামায়ণ ও মহাভারতের যে জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের কোন সঙ্গতি নেই। রবীন্দ্রনাথ যে জীবনকে কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন তার সঙ্গেও আমাদের বাস্তব জীবনের ব্যবধান অনেক। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অসীমকে সীমার মধ্যে বাঁধতে,—চিনতে,—অপ্রাপণীয়াকে লাভ করতে; অন্তরের সদাজাগ্রত সৌন্দর্যবোধ কুৎসিতের মধ্যেও সুন্দরের অস্তিত্ব নিরীক্ষণ করতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে একটি বৃহৎ আদর্শ ছিল বলে এবং তাঁর প্রতিভা অসামান্য ছিল বলে তাঁর কাছে কল্পনা বিলাস অভ্যাসের ক্লান্তিতে পর্য্যবসিত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে যাঁরা কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁদের কবিতা হ'য়ে উঠল আদর্শ-বিহীন, অশরীরী। ঐ অবস্থা আদৌ স্বাভাবিক নয়, তাই রবীন্দ্রধারার পাশে রবীন্দ্রোত্তর ধারার সূচনা হোল এবং এর সূচনা করলেন যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল ইসলাম।

যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী, তাঁর ধারণা 'বিশ্ব অতল দুঃখ-সিন্ধু!' ভাববিলাসিতার বিরুদ্ধে প্রথম সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যতীন্দ্রনাথ বললেন'—

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায়, অচেনারে লবে চিনে
নতুন নতুন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে,
এ সবি রঙিন কথার বিম্ব মিথ্যা আশায় ফাঁপা।
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কোথা সে অগ্নিবাণী
জ্বালাবে সত্য, দেখাবে দুখের নগ্নমূর্ত্তিখানি।
কালোকে দেখাবে কালো বলে আর,
বুড়োকে দেখাবে বুড়ো,
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো।
এ কথা শিখিব কবে,
ধান-ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকেনা
ঢেঁকির রবে।

* * * *

সকাল হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছ নিজ গলা
সন্ধ্যা বেলায়ও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হোল না বলা।
মিছে এ প্রয়াস ভাই,
যে কথা তোমার হোলনা বলা নেই সেই কথাটাই।
সে কেবল মরীচিকা,
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই
তার থাকা॥"

কল্পনা বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়াকে যতীন্দ্রনাথ কোনদিনই ভাল বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্য-সাধনার আরম্ভ হয়েছে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সক্রিয় প্রয়াসের দ্বারা। কবি দুঃখের দাবদাহকে জীবনে বরণ করেছেন, তাঁর আরাধ্য হয়েছেন দুঃখের দেবতা রুদ্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পরমাত্মা আনন্দময়, আর বিশ্বসৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। এ হচ্ছে উপনিষদেরই কথা। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু বললেন বিধাতা চির দুঃখী। নিজের মনের ব্যথাকে গোপন করার জন্যই তাঁকে বিশ্বসৃষ্টি করতে হয়েছে। অবশ্য চিরদুঃখী স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর দুঃখকে গোপন করতে পারে নি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে কিন্তু এই সুর শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় নি,—পরিণত বয়সে

তাঁকে সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। যৌবনে কবির মুখ ছিল রূপ বিমুখ আর বার্দ্ধক্যে হয়েছে রূপ-পিপাসু। যৌবনে কবি বলেছিলেন, প্রেম বলে কিছু নাই, কিন্তু বার্দ্ধক্যে এই দৃষ্টির পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রেম সম্বন্ধে কবিচিত্ত সচেতন হয়ে উঠেছে।

মোহিতলাল দেহবাদী; প্রেমকে আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে তিনি তাকে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আর তাকে মসৃণ ও সুশ্রী করার জন্য গার্হস্থ্যধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোহিতলালের মূল কথা হচ্ছে,—

হায় দেহ নাই তুমি ছাড়া কেহ
জানি তাহা প্রাণে প্রাণে
মূরতি পাগল মনের মমতা নাই
তাই ধায় তোমা পানে॥"

যতীন্দ্রনাথ চেতনাকে জড়ে মিশিয়েছিলেন, মোহিতলাল তাকেই দেহের সংগে মিশিয়েছেন। এই দেহবাদ ও জড়বাদ বাংলাকাব্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টি করলেও মোহিতলালের কাছ থেকে এদের কথা বেশী শোনা যায় নি। তাকেও কল্পনার কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে; রবীন্দ্রপ্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি।

নজরুল বিদ্রোহী কবি; 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, কবিচিত্তে যে ম্লান বেদনার ছায়া সংক্রামিত করেছিল সেই ছায়াছন্ন কবিচিত্ত থেকেই তাঁর প্রথম কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহী কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ব্যবস্থার বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেমন যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মী কোথা ছিলে এতদিন?
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হোল ভিটাহীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজল আজি কত না জীবের নিভায়ে জীবন-বাতি।
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি-মুণ্ডের মালা।"

তেমনি নজরুলও বলেছেন,,—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
যবে অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না,
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

কিন্তু নজরুলের কাব্যেও বিদ্রোহের কড়াসুর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছে। যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে না পারলেও যে নতুন একটি ধারার সূচনা করেছেন, তা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ এ কথা অনুভব করেছিলেন যে তাঁর কাব্য ধরার ধূলিকে ত্যাগ করছে,—সাধারণের আশা আকাঙ্খা ও আনন্দ বেদনা তার মধ্যে রূপ পাচ্ছে না। তাই শেষের দিকে তিনি আধুনিকতাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম নতুন রবীন্দ্রনাথ নিজেই,—এরকম একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। কবির এই নতুন হওয়ার চেষ্টা অর্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করার ইচ্ছা কতখানি সার্থক হয়েছে, তাই এখানে বিচার করা হবে।

আধুনিকতার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে যে শক্তি রয়েছে তার চেতন সত্তায় অবিশ্বাস। এই থেকেই আসে বিশ্বের শুভময়তায় অবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই বিশ্বসৃষ্টিকে শুভ ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ বলে মেনে এসেছেন। শেষের দিকে কিন্তু এই শুভময়তা সম্বন্ধে কবির মনে সন্দেহ জেগেছে।

'প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে এই সন্দেহ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কবিতায় কবি বলেছেন,—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে ;
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥

এখানে কবিচিত্তের সন্দেহাকুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির মনে হয়েছে হয়ত বা বিশ্বের বিধান মঙ্গলময় নয়, হয়ত বা এখানে সাম্য ও সামঞ্জস্য নেই, বুঝি বা অত্যাচারীর অত্যাচার ও অপরাধীর অপরাধ বিশ্ব-বিধানকে অশুভ করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ আরো কয়েকটি কবিতায় প্রাত্যহিক জীবন থেকে রূপকল্প গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং এটা হচ্ছে আধুনিক-তার অন্যতম লক্ষণ। কবি আধুনিক হ'ন খানিকটা আধুনিক ভাষা ও রীতি গ্রহণ ক'রে, আর খানিকটা আধুনিক জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে। রবীন্দ্র নাথ শেষের দিকের কয়েকটি কবিতায় বাস্তব জীবনকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। নিম্নে 'ঘণ্টা বাজে দূরে' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করেছি।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশ্বত্থতলা ;
খেয়ার আশায় লোক বসে,
পাশে রাখি হাটের পসরা
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি ;
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়-মুখো গাড়ী
পাটের বোঝাই ভরা ;
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে ;
লেজের চামর হানে পিঠে।
শর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলে নৌকা এলো ঘাটে
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি ;
মাথার ওপরে ওড়ে চিল।
মহাজনি নৌকাগুলি ঢালু তটে বাঁধা পাশাপাশি ;
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে ;
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেল গাড়ী
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনি রেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্ব জয়ের দীর্ঘ বিজয় পতাকা।

এখানে মেঠো পথ, অশথতলা, হাটের পসরা গুড়ের কলস, মাছি, বলদ, স্তূপাকার সর্ষে, মেছুনি, মহাজনি নৌকা, মোষ, রেলগাড়ী সব কিছুরই বর্ণনা আছে ; কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। আর তা ছাড়া, এখানকার ভাষা ও রীতিও হচ্ছে আধুনিক, খুবই সরল ; এরা সহজেই মনের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। কিন্তু এ ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে খুব বেশী আমরা পাই না।

পূর্বে বলেছি, আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বিশ্বের শুভময়তায় অবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট, উপনিষদিক শুভবুদ্ধি সব সময় তাঁকে ঘিরে রেখেছিল ; তাই তাঁর পক্ষে আধুনিকতাকে মনে প্রাণে বরণ করা বা ফুটিয়ে

তোলা সম্ভব হয়নি। 'বাঁশি' কবিতাটিকে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতা বলে সমালোচকেরা স্বীকার করেছেন। কবিতাটিতে 'সওদাগরী' আফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর জীবনের একটি করুণ আলেখ্য অংকন করা হয়েছে। কেরাণী দরিদ্র, আলো জ্বালাবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে সন্ধ্যা কাটায়, থাকে একতলার একটা স্যাঁৎস্যাতে লোনা ধরা ঘরে। এর বাসস্থান নোংরা, পরিবেশ আরও খারাপ। এখানেই কিন্তু কবিতাটির শেষ হয়নি। হঠাৎ এক বৈকালে বাঁশির করুণ সুর এসে এর কর্ণে প্রবেশ করেছে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এই কেরাণীরও অন্য একটি স্বরূপ আছে এবং সে স্বরূপে সে নিত্যলোকের অধিবাসী।

তখনি মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিসহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সংগে
হরিপদ কেরাণীর কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ সুর ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

'হরিপদ কেরাণী'র তুচ্ছ স্বরূপ দেখিয়েই কবি ক্ষান্ত হন নি,—তার সত্য নিত্যরূপও দেখিয়েছেন। কবিতাটি হচ্ছে তুচ্ছতা থেকে নিত্যতার পথে যাত্রা, —ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের পথে অভিযান; কাজেই সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রধর্মী। এখন দেখা যাক্, যে অংশে গলির রূপ বর্ণনা করা হয়েছে সে অংশ কতটা সার্থক হয়েছে। এটি উদ্ধৃত করছি।

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভুতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁস আরো কত কী যে।

এখানে আমের খোসা, কাঁঠালের ভুতি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা সব কিছুরই অবতারণা করা হয়েছে; গলির নোংরামি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ষায় উত্তর কোলকাতায় এমন অনেক গলিই চোখে পড়ে, এটি নোংরা গলির বাস্তবরূপ। কবিতাংশটি, কিন্তু, গলির বীভৎসরূপ ছাড়া আর কিছু ফুটিয়ে তুলতে পারেনি; এর ইঙ্গিত মাধুর্য্য নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, যে কাব্য শব্দ ও বাচ্য অর্থের গণ্ডী অতিক্রম করে অন্য সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, তাই হচ্ছে সুকাব্য। আলংকারিকেরা একেই বলেছেন ধ্বনি কাব্য। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ কল্পলোকে বিহার করেছেন, ততক্ষণ তাঁর প্রতিভা সঙ্কুচিত হয় নি। কল্পনার রাজ্যই তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র। যখন কবি প্রতিভা কল্পলোক ত্যাগ করে নগ্ন বাস্তবতার রাজ্যে অবতরণ করেছে তখন তা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া, দুর্মর আশা সব সময়ই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রেখেছিল; তাই নৈরাশ্যকে স্পর্শ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম নতুন রবীন্দ্রনাথ নিজে হলেও তাঁর কবিতা আধুনিকতার শীর্ষস্থান স্পর্শ করতে পারেনি।

আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র প্রভাব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন; তিনি পূর্ণ মাত্রায় রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত। জীবনানন্দ হতাশার অন্তস্থলকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, আর ঔপনিষদিক শুভবোধও তাঁকে ঘিরে

রাখেনি ; কাজেই আধুনিক জীবন থেকে রূপকল্প গ্রহণ করে জীবনানন্দ যে কবিতা রচনা করেছেন, তা বর্ণনার মধ্যে সীমিত না থেকে অন্য অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনের বিরস বিবর্ণরূপ যে ভাবে বিধৃত হয়েছে তেমনটি আর কারো কবিতায় হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দুজনেই রাত্রির বর্ণনা করেছেন ; এঁদের বর্ণনার পার্থক্য আলোচনা করলেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ দিনের কর্মকোলাহলের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করেছেন এবং রাত্রির এমন একটি ছবি এঁকেছেন যেখানে সমস্ত কর্মকোলাহলের বিরতি ঘটেছে, প্রাণচাঞ্চল্যের অবসান হয়েছে। 'ঘরছাড়া' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

রজনীর মসীলিপ্ত মাঝে
লুপ্ত রেখা সংসারের ছবি—ধান কাটা কাজে
সারা বেলা চাষির ব্যস্ততা ;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের ; ছুটি পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈ হৈ রবে ; হাট বারে ভোরবেলা
বস্তা বহা গরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা ;
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ওপারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে-চলা।
নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ী যায় ছুটে॥

নৈশ স্তব্ধতার সুন্দর বর্ণনা ; কিন্তু এ কাব্যের অভিব্যঞ্জন সামর্থ্য নেই। এবার জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি।

হাইড্রেন্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্রেন্ট হয়ত বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন গভীর রাত নগরীতে নগরীতে ভিড় করে
নামে ;
একটি মোটরকার গাড়োলের মত গেল কেশে—
অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে ; সতত সতর্ক থেকে তবু,
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে ;
তিনটি রিকস্ ছুটে মিশে গেল শেষ
গ্যাসল্যাম্পে—
মায়াবীর মত যাদুবলে।
আমিও ফিয়ারলেন ছেড়ে দিয়ে,—হটকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে, দেওয়ালের পাশে,—
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে গিয়ে,—টেরিটি বাজারে,
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।
মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ,
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।
টান রাখে জীবিত ও মৃত পৃথিবীকে ;
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।

এখানে ফেঁসে যাওয়া হাইড্রান্ট, তৃষ্ণার্ত কুষ্ঠ রোগী, জীবিত ও মৃত পৃথিবীর মধ্যে সংযোগসাধনকারী মোটরকার ও রিক্সা, কাঠ, গালা ও চামড়ার ঘ্রাণ সব কিছুই কাব্যের উপাদান হয়েছে, অথচ কেবলমাত্র এদের বর্ণনাতেই কবির তাৎপর্য নেই। এ কবিতাংশ শব্দ ও বাচ্য অর্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাদের অতিক্রম করতে পেরেছে। এখানকার কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ, ডাইনামোর গুঞ্জন—এরা মিলে আধুনিক সভ্যতার নগররূপকে অভিব্যঞ্জিত করেছে। 'চীনাবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে' এই একটি মাত্র উপমার মধ্যে বর্ত্তমানে দর্শনের দুর্গমতা, রাজনীতির কর্কশতা, অর্থনীতির কৌটিল্য,—এক কথায়, আধুনিক জীবনের বিরস সামগ্রিকরূপ যেভাবে ফুটে উঠেছে তেমনটি খুব কম কবিতাতে দেখা যায়। তাহ'লে দেখা যাবে যে রজনীর বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতা রবীন্দ্রনাথের দৃ

আকর্ষণ করেছে, আর জীবনানন্দকে মুগ্ধ করেছে কুশ্রীর তৃষ্ণা, পেট্রোলের ঘ্রাণ ডাইনামোর গুঞ্জন, চামড়ার গন্ধ—এইসব। রবীন্দ্রনাথ রজনীর মসীলিপ্তির মধ্যে গভীর প্রশান্তি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি, জীবনানন্দ কিন্তু এর মধ্যে আধুনিক সভ্যতার মৃত্যুশয্যা দেখেছেন; আর তাই বিশুদ্ধ নাগরিক সত্তাকে বিধৃত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অবশ্য কর্মকোলাহলের বিরতি ও বিরাট প্রশান্তি—এইটিই রাত্রির সত্যরূপ না চর্ম-ঘ্রাণ-মন্থর ইঞ্জিন সংকৃত রূপটিই সত্য—এ প্রশ্ন বিচার সাপেক্ষ। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও তা নয়। তবে এইটুকুই বলা চলে যে দ্বিতীয় রূপটির সঙ্গে পরিচয় আমাদের ঘনিষ্ঠ, আর ঘনিষ্ঠ বলেই কবিতা পড়বার সময়ই পালার ও চামড়ার ঘ্রাণ আমাদের নাসারন্ধ্রকে ক্লিষ্ট করে, ডাইনামোর গুঞ্জন কানে প্রবেশ করে।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপকরণ হিসাবে [illegible] পোকা, মাছের কাঁটা, মরা বেড়ালের ছানা [illegible] প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন; জীবনানন্দের কবিতায় [illegible] ইঁদুর, ডাইনামো স্থান পেয়েছে। এ কথা স্বভাবতই মনে জাগে যে [illegible]

তাহ'লে কাব্যে কি কুশ্রীর স্থান নেই? এ প্রশ্নের উত্তর অনেক দিন আগেই আচার্য্য অভিনব গুপ্ত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, যা স্বভাবতঃ অসুন্দর তাও যখন কাব্যে প্রতিফলিত হয় তখন সুন্দর হয়ে ওঠে এবং এ হচ্ছে অলৌকিক কাব্য ব্যাপারের মহিমা। তাই আমাদের টেবিলে ফুলের বদলে ঘুঁটে রাখলে বেমানান হয় বলে, কাব্যেও সুন্দরের বদলে কুশ্রীকে স্থান দিলে বেমানান হবে এবং কাব্য অসুন্দর হবে—এ রকম কথা বলা চলে না।

উপনিষদের যুগ থেকে যে কাব্য সাধনার ধারা চলে এসেছে সেই ধারাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপ পেয়েছে। আবার সেই ধারার পাশে যে রবীন্দ্রোত্তর ধারার সৃষ্টি হয়েছে তারও পথিকৃৎ তিনিই। এ রকম একটি বিরাট প্রতিভার দৃষ্টান্ত আর একটি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে যুগচেতনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তা অতীতের, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বাস, শান্তি ও তৃপ্তি। যতীন্দ্রনাথ, ও জীবনানন্দ ও অন্যান্য আধুনিক কবিরা যে যুগ চেতনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তা' বর্তমানের; তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবিশ্বাস, অশান্তি ও অতৃপ্তি। আমাদের [illegible] মধ্যে অবিশ্বাস, অশান্তি ও অতৃপ্তির স্রোত প্রবাহিত বলেই আধুনিক কবিতার মধ্যে আমরা আমাদের খুঁজে পাই এবং তা আমাদের [illegible] লাগে। আমাদের চেতনার রক্তক্ষয়ী সাধনা যেভাবে আধুনিক কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তেমনটি আর কোথাও হয়নি।

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

তথা

বাঙলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস

অধ্যাপক কৌশাম্বীনাথ মল্লিক,
ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
ও
অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যাল,
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

পশ্চিম বাঙলা। জেলা বীরভূম। গ্রাম হেতমপুর। কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে এই যুগটিকে বলা হয়ে থাকে প্রাক্-কার্জনী যুগ। এ যুগে সরকারের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল না কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি বা policy. এ ছাড়া প্রথম শিক্ষা-কমিশন (১৮৮২-৮৩) শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারকে অবাধ নীতি (laissez-faire) গ্রহণ করবার নির্দ্দেশ দেয়। ভারতবর্ষে এই নীতি চালু করার পেছনে একটা মস্ত বড় যুক্তি ছিল যে, ইংলণ্ডেও এই সময় কি অর্থনৈতিক, কি উচ্চ শিক্ষা ব্যাপারে এই নীতিই ছিল কার্য্যকরী। খাস ইংলণ্ডেই যখন শিক্ষাব্যাপারে সরকার কোন হস্তক্ষেপ করছেন না তখন ইংলণ্ডেরই উপনিবেশ-স্বরূপ ভারতবর্ষেই বা সরকার বাহাদুর প্রভূত অর্থব্যয়ে উচ্চশিক্ষাকে সুগঠিত ও সুপরিচালিত করবেন কেন? শিক্ষা ব্যাপারে যাতে অর্থব্যয় না করতে হয় তারই একটা যুক্তিপূর্ণ অজুহাত খুঁজছিলেন এ দেশের সরকার এবং প্রথম শিক্ষা কমিশন সেই অজুহাতই জোগালেন। প্রথম শিক্ষাকমিশন বা সরকার কি চিন্তা করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ভাল না মন্দ এ সব বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমাদের দেখতে হবে,—এই নীতির ফলে শিক্ষা প্রসার ঘটেছিল কি না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সে সময় অর্থনৈতিক মূল্য ছিল এবং চাহিদাও ছিল। চাহিদা বাড়লে সরবরাহও বাড়ানোর চেষ্টা চলবে। আর এই চাহিদা ছিল দীর্ঘকালব্যাপী চাহিদা (long term demand). এরই ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে উঠল বিশেষ তৎপর। কিন্তু সে অনুপাতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দানকারী স্কুল কলেজের সংখ্যা ছিল নগণ্য,—বিশেষ করে গ্রামবাসীদের পক্ষে কলেজী শিক্ষা তো অচিন্ত্যনীয়। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে সহরে পড়তে আসা এবং পড়বার জন্য সহরে একটা আস্তানা রাখা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। বাৎসরিক গড়পড়তা আয় যাদের কুড়ি টাকার বেশী নয় এবং এমনই লোক তখন আমাদের দেশে বেশী, তাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার জন্য সহরে ছেলে পাঠানো এক রকম অসম্ভবই ছিল। গ্রামাঞ্চলের মেধাবী ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা দূর করবার কোন উপায় বা আয়োজনই ছিল না এবং সরকারের দৃষ্টি এ সব

ব্যাপারে ছিল না বললেই চলে। সাধারণ জমিদারগণ স্কুল স্থাপন পর্য্যন্ত অগ্রসর হতেন, কলেজ স্থাপনের কথা তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু মুখ্য জমিদার শ্রেণীর কেউ কেউ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নিজেরা হয়ত তাঁরা বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের এলাকার মেধাবী, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে না—এ কথা তাঁদের ভাল বোধ হয়নি। এরই ফলে বাঙলা দেশে কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়। এগুলো স্থাপন করেন বড় বড় জমিদার শ্রেণী;—কিন্তু এর সবগুলোই সহরে কিংবা আধা সহরে স্থাপন করা হয়, কারণ স্থাপয়িতারা এই সব জায়গায়ই বসবাস করতেন। এই প্রসঙ্গে বহরমপুর, বর্দ্ধমান, কুচবিহার কলেজের নাম করা যেতে পারে। গ্রামে কলেজ স্থাপন, শুধু বাঙলা দেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে, বোধ হয় প্রথম যখন হেতমপুরে কলেজ স্থাপিত হয়। হেতমপুররাজকে এ বিষয়ে "পুরোধা"র সম্মান দিতে হবেই। মনে হয় হেতমপুররাজ প্রাচীন ভারতের শাসকদের নীতি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাই কেবল মাত্র কূপ খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণেই অর্থ ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখেন নি,—প্রজাসাধারণ ও গ্রামবাসীদের মানসিক উন্নতির পথও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রথম শিক্ষা কমিশন আর কিছু না করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রায় সব কলেজই সরকারী বা মিশনারী ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয়গণ উচ্চ শিক্ষা ব্যাপারে অগ্রসর হলেন। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজের সংখ্যা গোটা ভারতবর্ষে ছিল ৭২টি মাত্র। আর সরকারী, বেসরকারী, মিশনারী সর্ব্বসমেত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৩৬। এর মধ্যে বাঙলা দেশেই ছিল ৪৬টি কলেজ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে গোটা ভারতবর্ষে কলেজে পড়া ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫৯৮৯ জন। এর মধ্যে ৬৬৮৬ জন ছিল ব্রাহ্মণ, ৭৯৬৪ জন অন্যান্য জাতি, ১২৫৯ জন মুসলমান। হেতমপুর কলেজে এই সময়ে ছাত্রদের মধ্যে কোন্ জাতির সংখ্যা বেশী ছিল তা জানবার মতো কোন উপকরণ আমাদের হাতে না থাকলেও সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে হিন্দুরাই ছিল শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী এবং হিন্দুদের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণ ছাত্রই ছিল বোধহয় বেশী। প্রাচীন ভারতে তাঁরাই বিদ্যাদান করতেন এবং বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন। ইংরেজ আমলে যাতে তাঁদের অবনতি না ঘটে তার জন্য তাঁরা যে সজাগ ছিলেন এ কথা এই সংখ্যা থেকেই অনুমান করা যায়। এঁকে কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়াস বলা হবে, না, জ্ঞান দীপ অনির্ব্বাণ রাখার প্রচেষ্টা বলা হবে—সমাজবিজ্ঞানী তার উত্তর দেবেন।

হেতমপুর কলেজ যখন স্থাপিত হয় তখন এবং তার পরবর্ত্তীকালে কলেজীশিক্ষার গলদ যে ছিল তা বুঝতে পারা যায় এবং তার ফল আজ আমরা ভোগ করছি। প্রথমত, পুঁথিগত বিদ্যার প্রাধান্য এবং কলেজে ব্যক্তিগত মনোযোগের (individual attention) অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ছিল না সর্ব্বজনীন, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীই শুধু শিক্ষালাভ করতে পারতো। স্ত্রীশিক্ষা ছিল না বলা চলে। তৃতীয়ত, শিক্ষার বাহন ছিল ইংরাজী, পরীক্ষার বাহনও তাই। কলেজীশিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান অস্বীকৃত, পাঠ্যসূচীতে অপাঙক্তেয়। অনেক কাল পরে, সম্ভবত, স্যর আশুতোষের চেষ্টায় মাতৃভাষা পাঠ্যসূচীতে স্থান পায়। মাতৃভাষাকে অনাদর করা তখন গৌরবের কথা। ঋষি বঙ্কিম সাহিত্য-

ক্ষেত্রে বাঙলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও শিক্ষা-ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় নি। ফলে মাতৃভাষা রইল পঙ্গু হয়ে, পাঠ্যপুস্তক রচিত হল না মাতৃভাষায়। আজ আমরা ইংরাজী ভাষা উঠিয়ে শিক্ষার মান কমে যাবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছি এবং উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষায় লিখিত উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নেই বলে যে জিগির তুলেছি তার একমাত্র কারণ হল মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে তার নির্দ্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয় নি, বরঞ্চ মাতৃভাষাকে পঙ্গু করে ইংরাজীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্য। এর ফলে জাতি-প্রধান আমাদের দেশে আরেকটি জাতি সৃষ্টি করা হল। ছাত্রগণও এর ফলে অধীত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করতে শিখলো না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষাব্যবস্থার ফলবিচারের মাপকাঠি হ'ল। ছাত্ররা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে শিখলো।

এই সব দোষক্রটি যে সে সময়ে কারো দৃষ্টি-গোচর হয়নি তা নয়। তাঁরা এ বিষয়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সচেতন করবার চেষ্টা যথেষ্টই করেছিলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? এই রকম শিক্ষার চাহিদাই তখন ছিল। এর ফলে দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও কলেজের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ঠিক এই সময়েই জাতীয় জীবনের ইতিহাসেও এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়,—ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবাদ দেখা দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব অপ্রকাশ রইলো না। ভারতবর্ষে কয়েকটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ ও কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ। এই সব শিক্ষারবলে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে নূতন ধরণের শিক্ষাদানের চেষ্টা হতে লাগলো।

এই সময়ে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন এলেন বড়লাট হয়ে। এসেই তিনি দেশের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্ত্তাদের ডাকা হল। সিমলায় বসল বৈঠক। বৈঠকী আলোচনা আজও অজ্ঞাত। অনেকে ভাবলেন কার্জ্জন ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করছেন। তাঁর শিক্ষা-নীতির পেছনে এক গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করা হল। এই সময়েই ভাগ হল বাঙলা দেশ। দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন। ছাত্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সরকার স্বভাবতই সুনজরে দেখলেন না একে। আরম্ভ হ'ল ছাত্র দমন। দেশে জয় হল চণ্ডনীতির। দেশের নেতারাও চুপ করে রইলেন না। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হল। যন্ত্র শিক্ষার জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল খোলা হল। কিন্তু নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারল না। এর কারণ, দেশের লোক তখন ইংরাজী শিক্ষাই চেয়েছিল এবং জাতীয় শিক্ষায়তনগুলো থেকে যে সব ছাত্ররা বের হবে তাদের ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হল না। কোনরূপ সরকারী চাকুরী তারা পেল না; আর তখন চাকুরী বলতে সরকারী চাকুরীই বোঝাতো। শুধু রয়ে গেল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট। পরে এরই নাম হয় যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি অধুনা যা' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

এদিকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ফলে কলেজগুলোর অবস্থা প্রথমদিকে সঙ্গীন হয়ে উঠল। নূতন কলেজ স্থাপন সহজসাধ্য রইল না। বিজ্ঞান শিক্ষাও (Practical বাদে) এই সময় প্রত্যেক কলেজে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলে গণ্য

হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট থেকে অনুমোদন লাভ করা ভগবদ্দত্ত জিনিসের মতই দুর্লভ হয়ে পড়লো। এই আইন, কলেজগুলোর মৃত্যু ঘোষণা করবার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করলেন।

লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষানীতির যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষার পরবর্ত্তী ইতিহাস তা' অমূলক বলে প্রমাণ করলো। কার্জ্জনের নীতি শিক্ষা সঙ্কোচ নয়, কারণ, এই নীতি অনুসরণের ফলে কলেজগুলোর অবস্থা ভাল হয় এবং ছাত্রসংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। লর্ড কার্জ্জন গুণতির বদলে চেয়েছিলেন গুণ। তাঁর এই চাওয়া কতটা সফল হয়েছিল বলা কঠিন।

এর পর কলেজী শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিল ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' বা 'স্যাড্‌লার কমিশন' নিযুক্ত হল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। রিপোর্ট বের হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। কলেজী শিক্ষাবিষয়ে কমিশনের মত ছিল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিলোপ সাধন এবং তিন-বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তন। কমিশনের মতে কলেজের প্রথম দু' বছরের কাজ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ হবে। এর ফলে কলেজী শিক্ষায় এক প্রবল আলোড়ন দেখা দিল যেমনটি দেখা দিয়েছে আজকের দিনে। এর পরই যে কলেজগুলোতে বি-এ পড়ানো হতো না, সেগুলোতেও বি-এ পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে—যা প্রথমে এফ-এ পড়ানোর কলেজ ছিল—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পড়ানোর অনুমোদন জোগাড় করলো। এদিকে স্যাড্‌লার কমিশনের নির্দ্দেশ মেনে নেওয়া সম্ভব হল না,—কারণ অর্থাভাব। কমিশনের রিপোর্ট রিপোর্টই রয়ে গিয়ে সরকারী মহাফেজখানায় ও গ্রন্থাগারে কীটের আহার জোগাতে লাগলো। স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট মেনে নিতে পারলে আজ শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারতো না বলেই মনে হয়। কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থব্যয় ইংরেজ সরকার মনে করতেন unproductive. বাঙলা দেশের কলেজগুলোতে তাই আই-এ শ্রেণী দুটি রয়ে গেল, আই-এ পরীক্ষাও টিকে গেল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হল। সেই থেকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কলেজের ইতিহাস একই পথে চলেছে। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চলেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। নূতন শিক্ষাসংস্কার নীতি যখন দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনে প্রয়োগ করা হবে তখন হেতমপুর কলেজও বাদ যাবে না।

হেতমপুর কলেজ প্রথম থেকে স্বাবলম্বী। সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশী অন্তত হেতমপুর কলেজ ছিল না। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে নানা কারণে এই কলেজ সরকারী সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া দোষের নয়। হেতমপুর কলেজ এই গর্ব্বটুকু করতে পারে যে বিদেশী সরকারের সাহায্য সে গ্রহণ করেনি। মাঝে এই কলেজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। চারিদিকে নূতন কলেজ স্থাপন এর একটি কারণ। এ ছাড়া কলেজের ট্রাষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশই বিহার সরকারের জমিদারী বিলোপ আওতায় পড়ে যাওয়াতে কলেজের প্রাপ্য বার্ষিক ভাতা পাওয়া হয়ে পড়লো দুরূহ। কলেজ কি

ক'রে চলেছে তা জানেন তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ। তবুও কলেজের দরজা বন্ধ হয়নি শুধু অধ্যাপকগণের মরণপণ চেষ্টায় ও দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য। মহারাণী পদ্মসুন্দরীর সাধের এই হেতমপুর কলেজ। এই কলেজের মধ্যেই বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন মহারাণী পদ্মসুন্দরী। যাঁদের দুঃসহ ত্যাগে ও দুঃখ বরণে এই কলেজ মরণ সাগরের তীর থেকে ফিরে এলো নবজীবনের পথে সেই অধ্যাপকবৃন্দ মহারাণীর উত্তরাধিকারীসদৃশ। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই থেকে হেতমপুর কলেজ গভর্ণমেন্ট সপন্সরড ডিগ্রী কলেজে পরিণত হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজের নানান্ উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতির মূলে রয়েছে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের উৎসাহ, অধ্যাপকগণের সহযোগিতা, রাজপরিবারের আনুকুল্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-প্রসার নীতি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই কলেজী শিক্ষার বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু হয়। কলেজী শিক্ষার কোন মূল্য নেই এমনি একটি ভাব গণমানসে দেখা দেয়। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই বেশী প্রকট হয়ে উঠছে,—কারণ কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে কেবলমাত্র যন্ত্র, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থাতেই বেকার সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান প্রয়োজন। বেকার সমস্যার সমাধান কলেজী শিক্ষার বিলোপ সাধনে নয় কিম্বা কলেজী শিক্ষা বেকার সমস্যার জনকও নয়—একথা আমাদের জাতীয় সরকার বুঝতে পেরেছেন বলেই আমাদের দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কলেজী শিক্ষার উন্নতি সাধনের চেষ্টাই করা হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে সুদূর প্রসারী পরিবর্ত্তনের ইংগিত নিয়ে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। উচ্ছেদের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না বলেও একথা আমরা অনায়াসে স্বীকার করতে পারি যে আমাদের কলেজ এমনি একটি জমিদারকুলের এক মহীয়সী নারীর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। এই মহীয়সী নারী সম্বন্ধেই কানিংহাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, "It is very charming to hear of the foundress Maharani to whom the idea and the endowment of the college are entirely due. It is difficult to comprehend how a conception of the value of education that was worth of the nation-builders of Germany and Japan could have penetrated behind the purdah of a remote Rajbari in a corner of Bengal before it had come to be dreamt of by a few of the most enlightened of the Bengali men as a distant ideal to be aspired after but never materialised. This subjected woman actually invested her whole property in that education which was to bring about the salvation of her country."

পরিশেষে আসে শিক্ষার পরিবেশের কথা। উপযুক্ত শিক্ষক, প্রচুর পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষায়তনের মধ্যে সহজে, স্বচ্ছন্দে চলা ফেরার মত জায়গা,

ক্লাশরুমে ছাত্র পিছু অনেকখানি বসবার জায়গা—এসব চাই। ছাত্রও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু সর্ব্বোপরি যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে শিক্ষাবিতরণ ও শিক্ষাগ্রহণের একটি উপযুক্ত পরিবেশ। সহরের ধূলি-মলিন আবহাওয়া, নানান্ আন্দোলনে আলোড়িত ও কোলাহল মুখরিত সহরের দূষিত পরিবেশে যে উপযুক্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না,—একথা আজকের দিনে অনেক শিক্ষাবিদের মুখেই শোনা যাচ্ছে। সহর থেকে দূরে শান্ত পল্লীমায়ের কোলে আমাদের এই কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ অনেকাংশেই সেই দুষ্ট পরিবেশ থেকে মুক্ত। তা সত্ত্বেও এই কলেজের কিছু কিছু অসুবিধা আছে। কলেজ বাড়ীটির অভ্যন্তরে বিশেষ জায়গা নেই। তদুপরি চারিদিকে গৃহস্থের গৃহ বেষ্টিত এই কলেজে পঠন-পাঠনের কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করা হয়ে থাকে। বিয়ে, পৈতে, বারো মাসে তেরো পার্ব্বনের ঢাকঢোলের আওয়াজ প্রায়ই কলেজের পঠন-পাঠনে বিঘ্ন হয়। কাজেই পরিবেশটি সুন্দর হলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়।

৮ অধুনা মানসায়র ছাত্রাবাসের (এটি কলেজেরই ছাত্রাবাস) কাছে বর্ত্তমান রাজপরিবারের সৌজন্যে এই কলেজ পেয়েছে ৪২ বিঘা জমি। কলেজ এবং ছাত্রাবাসগুলি এক জায়গায় থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি মানসায়র ছাত্রাবাসের কাছে বর্ত্তমান কলেজকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানেই যদি কলেজকে বেষ্টন ক'রে ছাত্রাবাস ও অধ্যাপক এবং অন্যান্য কলেজ কর্ম্মচারীদের গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তবে আমাদের মনে হয় শিক্ষার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ট হবে, যেখানে শাল মহুয়া পিয়াল বেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশে নানান্ বিষম প্রভাবের হাত এড়িয়ে ছাত্রদের কাছে টেনে নিয়ে পঠন-পাঠন চলবে সুষ্ঠুভাবে। মানসায়র ছাত্রাবাসের নিকটে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকাতে চিকিৎসারও ব্যবস্থা রইল হাতের কাছেই। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কি সম্ভব,—যখন ইতোমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ত্তমান কলেজ বাড়ীটির মেরামত কল্পে ও বিজ্ঞানভবন নির্ম্মাণকল্পে অনেক টাকা ব্যয় করেছেন ? সানুনয় উত্তর দেবো—এখনও সম্ভব।

হেতমপুর রাজ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি একটি উচ্চতর সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের বাড়ীর জন্য এখানকার রাজপরিবার তাঁদের একটি বাড়ী দিয়েছেন। কিন্তু সেই বাড়ীতে অনেক মেরামত প্রয়োজন, অনেক ভাঙা-গড়া প্রয়োজন। এখনও বোধ হয় তার কাজ সুরু হয়নি। কলেজের গৃহনির্ম্মাণের টাকাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেবেন, স্কুলের টাকাও সেই সরকারই দিচ্ছেন। কাজেই অর্থদানকারী সরকার যখন এক তখন এই আবেদনটুকু আমরা আমাদের শিক্ষা-সচিবের কাছে পেশ করার অনুমতি ভিক্ষা করছি—বর্ত্তমান কলেজের গৃহ (নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান ভবন সমেত) হেতমপুর উচ্চতর সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া হোক এবং উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য সংরক্ষিত অর্থ দ্বারা মানসায়র-ছাত্রাবাসের সংলগ্ন বিস্তৃত জায়গায় নতুন কলেজভবন, ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকদের গৃহনির্ম্মাণ করে কলেজী শিক্ষার সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা হোক।

বীরভূমিকায় হেতমপুর

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ, কলাবিভাগ
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

শ্যামা বঙ্গের বীরভূমি তলে তোমারি অভ্যুদয়,
প্রণমি তোমায় হে বাণীকুমার সত্যের পরিচয়—
মহান বিদ্যালয় !
দ্বাপরের লীলা গলে মিশে গেছে যমুনার নীলজলে
তারি মাঝ হ'তে একটি ফলক হেথায় এসেছে চলে
কৃষ্ণনামের পুণ্য ঘোষিতে বুঝি বা শান্তিময়—
তোমারি অভ্যুদয়।

কোথায় কৃষ্ণ কোথায় হারালো দ্বাপরের দিনগুলি
নীপ-তমালের শাখাগুঞ্জন কোথা সেই ব্রজবুলি ;
কোথা গোপিকার যমুনাবিহার কোথা রাখালের সাজ
কোথা কুঞ্জের মঞ্জু বিছানো কৃষ্ণচূড়ার লাজ ;
কোথা গোধনের পুচ্ছ দোলায়ে শান্তির অভিযান
কোথা বৃন্দার মন্দ ছন্দে কুন্দ ফোটার গান।

কোথা ভগবান পাঞ্চজন্য কোথা উদ্ধব জ্ঞানী—
কোথা সাত্যকী কোথা মহাবীর বলরাম অভিমানী ;
কোথা শ্রীদামের জ্ঞান বিতরণ সুদামের মিতভাষ
অষ্টগোপীর প্রেমের ঠাকুর কোথা সেই চারুহাস ;
ভাবিছ সবাই ডুবিল কোথায় কোন যমুনার জলে—
কোন্ তমালের শ্যামল কাতর ঝরে-পড়া-রেণুতলে।

সব আছে জীয়ে পূর্ব্বের মত কিছু ক্ষয়েনিকো জানি,
দিন আর দেহ লিখে দিয়ে গেছে ইতিহাসময় বাণী।
প্রকৃতির রঙে জমাট্ বিলোল্ সেই সব রূপগাথা,
সেই মহাগীত জীবনের বেদ আজি কাব্যের কথা।

তার পরিচয় যোগ্য কর যদি জীবনের মহাকাজে
এসো গো তাপস-তাপসী সবাই এই বীরভূমি মাঝে।

চোখ মেলি দেখো দ্বাপরের সেই সত্যের পানে চাহি,
গত দিবসের উজল কাহিনী আজিও অভাব নাহি ;
রূপান্তরের আবরণে ঢাকা সবি তাই অক্ষয়
শ্যামাবঙ্গের বীরভূমি বুকে তারি মহাসঞ্চয় ;
সেই লিপিকায় সেই গীতিকায় চিরকাল ভরপুর—
বঙ্গমাতার বীরভূমি-বালা তনয়া 'হেতমপুর'।

সেই দ্বাপরের জীবনের রস যমুনার ধারা হয়ে
নরনারায়ণ কীর্তি প্রচারি' আজো হায় ওই বহে !
কূলে দেখো তাই কেন্দুবিল্ব দেবের জন্মস্থান
দ্বাপরের লীলা প্রচারিতে প্রভু জয়দেব ভগবান—
—ভক্তপ্রাণের গীতগোবিন্দ দেবের হস্তাক্ষর
আমাদেরি মাঝে হেথায় দেখি যে উজ্জ্বল ভাস্বর !!

আমাদেরি মাঝে ওই যে ঘুমায় নান্নুরের প্রিয় কবি
প্রেম গীতিকার 'চণ্ডীর দাস' বৈষ্ণব কুলরবি,
রামী রজকিনী উড়াইল যার কীর্ত্তির পীত ধড়ি
আমাদের কত নিকটে তাদের ভিত্তির ইটা পড়ি ;
তারি কাছে বুঝি জাগিয়া রয়েছে নরতীর্থের স্থান—
বিদ্যাপতির পদরেণুকায় বাড়িল যাহার মান।

আমাদেরি পাশে তুচ্ছ পল্লী ওই যে ময়নাডাল
শোন তুমি সদা কীর্ত্তনামৃত ঘন খোল-করতাল,
হেথা একদিন মহাপ্রভুবর চৈতন পদভার
পড়েছিলো তাই আজিও হেথায় কত পূজা উপচার
আকাশে বাতাসে একাকার দেখি পড়ে ঢলাঢলি হ'য়ে
দ্বাপরের স্মৃতি কীর্ত্তনগানে ভাবের আবেশ পেয়ে !

আমাদেরি এই আঁখির সুমুখে ভদ্রপুরের গ্রাম
যার ধূলিকায় লেখা মহারাজ নন্দকুমার নাম ;
ফাঁসির মঞ্চে সত্যের বলি ঘটে গিয়েছিল যবে
সেই ইতিহাস ভারততথ্য যদি চাও এসো তবে—

তারি আশে-পাশে ঘুম যায় ওই পল্লীটি রায়পুর
লর্ড এস, পি, সিংহের স্মৃতি নিয়ে সুখে ভরপুর।

ওইতো হেথায় 'ভীমগড়' আর ওই 'পাণ্ডেশ্বর'—
অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদের ইতিহাস স্বাক্ষর।
শস্য শ্যামল কান্তি কোমল চিকণ মধুর দেশ
হেথা প্রকৃতির নব অভিসার শত সুন্দর বেশ ;
হৃদয় দোলানো নয়ন ভোলানো পরাণ জাগানো মেয়ে
'জ্ঞান-গরিমায় সার্থক' হ'তে এসো আজ হেথা ধেয়ে।

আরো আছে এসো দেখিবে হেথায় আমাদের আশে-পাশে
তারাপীঠ আজো বামাক্ষ্যাপা নামে দৃষ্টি মধুর হাসে ;
দেবীর অঙ্কে বিহার করিল যেই মানুষের ছেলে
সার্থক হ'বে তার পদছোঁয়া মাটির কণিকা পেলে
সতীতীর্থের বহু তীর্থই হেথায় রয়েছে পড়ে—
অনাদিদেবের প্রলয় কাহিনী সারা দিগন্ত জুড়ে।

বক্রেশ্বরের উষ্ণসরিৎ বক্রমুনির কথা—
আছে এইখানে ঐতিহাসিক রচ ইতিহাস গাথা !
মহাশ্মশানের তন্ত্রসাধনা ঝিল্লীর মুখরণে
সাধক তোমারে সিদ্ধি দানিবে মরণ জয়ের পণে
এসো ডাকি তাই হিংসাবিহীন এই শান্তির দেশে
সত্য প্রেমের ধর্ম্মজয়ের পুণ্য ঋষির বেশে।

এসো এসো নব ছাত্রছাত্রী এসো বাঙালীর প্রাণ
শিল্পে কাব্যে সঙ্গীতে গানে রচ নানা অভিযান,
তথ্যবহুল ইতিহাসময় দর্শন হেথা আছে
বিশ্বজনের নিত্য-নূতন শরণ আজিকে যাচে—
প্রকৃতির বুকে বিজ্ঞান লিপি নীরবে ঘুমায়ে রয়
চিত্তচন্দ্র বিকাশি' আপনা তাই কারো আভাময়।

ওই হের সাধু অজয়ের কূলে ভাঙা দেউলের ছবি
সেনরাজ ওই লক্ষ্মণসেন তারি ইতিহাস সবি,
সেনবংশের রাজ্যকালের ভাগ্যের ইতিহাস
মাটির কবরে মৌন ভগ্ন জীবনের কারাবাস

ছুটে এসো তাই ছাত্রশিল্পী উদ্ধার কর তায়
কত যুগ হ'লো কেঁদে কেঁদে সারা বিস্মৃতি গ্লানিমায়।

ওই চেয়ে দেখো আমাদের এই বিদ্যালয়ের পাশে
জগৎকবির বিশ্বভারতী দৃপ্ত মধুর হাসে।
আমাদের যেথা বিরাম-বিহীন অনলস আনাগোনা
হৃদয়ে পরাণে দ্বার খোলাখুলি নিত্য রঙীন্ জানা ;
সেই শান্তির নিকেতন ওই কীর্ত্তিত বোলপুরে
বিজয় কেতন ছোঁয়ায় পরশ আমাদেরি 'মন্দিরে'।

আমাদের এই কথাবীথিটির ইতিহাস যদি নাও
তবে বাঙলার বাঙালীর ঠিক পরিচয় কিছু পাও।
আহ্বানি' তাই আমি গো ছাত্র-সুধী-সন্তান সবে
পরাণের ক্ষুধা মিটাতে হেথায় উপচার কিছু পাবে,
ছুটে এসো তাই শিল্প বিতানে সত্যের জাল বুনি
যেথা অন্নদা, তারা, হরি, আশা, শৈলজা ফাল্গুনী।

কথাশিল্পের কোরক আনিয়া কত ফুল আর রচি
তাই বলি আজ ছুটে এসো সখা সর্ব্বদৈন্য মুছি,
বিশ্বদেখার স্বপ্ন যেথায় শত শত জেগে রয়
সেথাকার কথা লিপিকায় আঁকা শুধু গ্লানি পরাজয় ;
মৌর্য্য, গুপ্ত, কান্ব, শুঙ্গ, পাল সেন আদি আর—
বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ইস্‌লাম, ব্রহ্মের সদাচার।

কত ইতিলিপি স্থলে জলে হায় মাটিতে পাতালে আজ
জ্ঞানের আলোক রশ্মি বিহনে সহিছে দারুণ লাজ,
তাই বলি এসো কলির দ্বাপর এই মিলনের স্থানে
ভরি তোল দেশ গড়ি তোল জাতি জ্ঞানে, গুণে, বিজ্ঞানে ;
দ্বাপরের ব্রজধাম এসো এই বীরভূমিকার দেশে
গৈরিক ধূলি মেখে নাও তব শুভ্র সোনা বেশে।

তারি মাঝে এই 'কৃষ্ণচন্দ্র মহান্ বিদ্যালয়'—
পুণ্যশ্লোকা রাজ কুলবধূ 'পদ্মার' পরিচয়।
স্বামীতীর্থের রচনা করিতে ফলক স্থাপিল যাহা
বাণী-মন্দির সতী-স্বাক্ষর রয়ে গেছে আজো তাহা ;

ছুটে এসো তাই ছাত্রশিল্পী উদ্ধার কর তায়
কত যুগ হ'লো কেঁদে কেঁদে সারা বিস্মৃতি গ্লানিমায়।

ওই চেয়ে দেখো আমাদের এই বিদ্যালয়ের পাশে
জগৎকবির বিশ্বভারতী দৃপ্ত মধুর হাসে।
আমাদের যেথা বিরাম-বিহীন অনলস আনাগোনা
হৃদয়ে পরাণে দ্বার খোলাখুলি নিত্য রঙীন্ জানা ;
সেই শান্তির নিকেতন ওই কীর্ত্তিত বোলপুরে
বিজয় কেতন ছোঁয়ায় পরশ আমাদেরি 'মন্দিরে'।

আমাদের এই কথাবীথিটির ইতিহাস যদি নাও
তবে বাঙলার বাঙালীর ঠিক পরিচয় কিছু পাও।
আহ্বানি' তাই আমি গো ছাত্র-সুধী-সন্তান সবে
পরাণের ক্ষুধা মিটাতে হেথায় উপচার কিছু পাবে,
ছুটে এসো তাই শিল্প বিতানে সত্যের জাল বুনি
যেথা অন্নদা, তারা, হরি, আশা, শৈলজা ফাল্গুনী।

কথাশিল্পের কোরক আনিয়া কত ফুল আর রচি
তাই বলি আজ ছুটে এসো সখা সর্ব্বদৈন্য মুছি,
বিশ্বদেখার স্বপ্ন যেথায় শত শত জেগে রয়
সেথাকার কথা লিপিকায় আঁকা শুধু গ্লানি পরাজয় ;
মৌর্য্য, গুপ্ত, কাম্ব, শুঙ্গ, পাল সেন আদি আর—
বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ইস্‌লাম, ব্রহ্মের সদাচার।

কত ইতিলিপি স্থলে জলে হায় মাটিতে পাতালে আজ
জ্ঞানের আলোক রশ্মি বিহনে সহিছে দারুণ লাজ,
তাই বলি এসো কলির দ্বাপর এই মিলনের স্থানে
ভরি তোল দেশ গড়ি তোল জাতি জ্ঞানে, গুণে, বিজ্ঞানে ;
দ্বাপরের ব্রজধাম এসো এই বীরভূমিকার দেশে
গৈরিক ধূলি মেখে নাও তব শুভ্র সৌম্য বেশে।

তারি মাঝে এই 'কৃষ্ণচন্দ্র মহান্ বিদ্যালয়'—
পুণ্যশ্লোকা রাজ কুলবধূ 'পদ্মার' পরিচয়।
স্বামীতীর্থের রচনা করিতে ফলক স্থাপিল যাহা
বাণী-মন্দির সতী-স্বাক্ষর রয়ে গেছে আজো তাহা ;

অধ্যাপনায় এলো আর গেলো কত জ্ঞানী গুণী হেথা
আজিও মেলাই রয়েছে জাতির পরম পূজ্য পিতা।

গুরুশিষ্যের ভক্তি বাঁধনে তপোবন একখানি
সত্যেরে পূজি শান্তির ঘটে ফুটে শ্রদ্ধার বাণী ;
হেথা বঙ্গের মহা-সঞ্চার হরেক গ্রন্থরাশি
ছাত্রমধুপ ব্যর্থ-পিয়াস তাই ফোটা ফুল বাসি,
দিক্‌-দিগন্ত ঝল্‌মল্‌-করা রামধনু-আঁকা-দেশে—
বাঙালীর ছেলে আছ যারা আজ ছুটে এসো ত্বরা হেসে।

হেথাকার জল হেথাকার বায়ু আয়ুর পরম সাথী
ধূ-ধূ প্রান্তর নদীকার হাওয়া শ্যাম তৃণ-ঘন-ছাতি
জীবনের গাঙে তরুণের ঢল ডেকে এনে দেয় জানি
অকাল প্রয়াণে সম্ভাবি' কভু হানিবে না হাতছানি ;
—প্রকৃতির বুক জোড়া কান্তারে শাল পিয়ালের বন
মহুয়া, পলাশ, শিমূল, সেগুন হরিতকী, চিরুণ।

—শুনে নাও শুধু এই ক'টি কথা সত্য বলি যা মানি
আমাদেরি এই পূজা-মন্দির লেখালো এসব বাণী ;
ষষ্ঠি-বর্ষ-বৃদ্ধ-ঋষির হীরক-জয়ন্তী দিনে
প্রীতি বরণের ডালাখানি ধরো আপনার মহাগুণে—
আমরা কেবল দ্বারের প্রহরী রহিনু সবার আশে
কবে আসে সেই 'মধু-লগ্নটী' বাঁধিবারে বাহুপাশে।

হেগেলের অদ্বৈতবাদ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বৈক্যানুভূতি

অধ্যাপক—প্রমোদবন্ধু সেন গুপ্ত
দর্শন বিভাগ, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

কবি স্রষ্টা, দার্শনিক তত্ত্বদর্শী, কবি আপন কল্পনার সহায়তায় মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দান করিয়া পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং পাঠক মনে রসসঞ্চার করেন। সুখদুঃখ বিক্ষোভিত, হাসি অশ্রু মুখরিত এই মানবজীবন, বিশ্বজগতের সুগভীর রহস্য কবির রসসিক্ত মনের নিকট এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লইয়া আত্ম প্রকাশ করে, লোকভাষায় লোকোত্তর বাণীর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত করেন কবি রসিক মনে। বহির্বিশ্বের রূপ রস ও সংগীতের মধ্যে কবির হৃদয় নিমগ্ন থাকে। সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যে কবির মন মুগ্ধ। দার্শনিক সৃষ্টিরহস্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া সৃষ্টি রহস্যের গভীরে প্রবেশ করিয়া তত্ত্বনির্য্যাস বাহির করিয়া লন। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মূলতত্ত্ব আছে তাহা আবিষ্কার করাই দার্শনিকের কাজ। খণ্ড জীবনের অন্তরালে অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা, খণ্ড সত্যকে অখণ্ড ও শাশ্বত সত্যের পটভূমিকায় অবলোকন করা, উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সূত্রটি আবিষ্কার করা দার্শনিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। এই খণ্ড সত্য যে অখণ্ড সত্যের বিকাশ এবং এই পরম সত্য যে, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক দার্শনিকের ইহাও অন্যতম উপলব্ধি। সংস্কারমুক্ত মনে জীবন ও বিশ্বজীবনের দিকে চাহিয়া দেখা এবং উভয়কে কেন্দ্র করিয়া যে সত্য বিরাজমান তাহা জানা ও যুক্তির সাহায্যে অপরের বোধগম্য করিয়া তোলাও দার্শনিকের অভিপ্রায়। কবির কার্য্য হইল পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, মানবীয় মনোভাবের মহিমা উপলব্ধি করা ও তাহাকে প্রকাশ করা, জীবন প্রেমিক কবি প্রকাশ করেন গভীর জীবনাশক্তি। কিন্তু দার্শনিক নিরাসক্ত তত্ত্বদর্শী। জীবনের আসক্তিকে ছাড়িয়া জীবনাতীত পরম সত্যকে সন্ধান করেন, সৌন্দর্য্য সম্ভোগ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব আবিষ্কারই তাহার কার্য্য। পদ্মপত্রে নীরবিন্দুর ক্ষণস্থায়িত্ব দর্শন করিয়া মায়াবাদী দার্শনিক জগতকে ও জীবনকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জীবনবাদী কবি যিনি সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় আকুল তিনি পদ্মপত্রের নীরবিন্দুর মধ্যে বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে প্রতিবিম্বিত দেখিতেছেন। জীবনকে মন্থন করিয়া কবি আনন্দ অমৃত আকণ্ঠ পান করেন। দর্শনের চরম সত্যের উপলব্ধির প্রচেষ্টায় জীবনের ক্ষণিকতায় বিচলিত হন না। কবি যে আপাতদৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবন সত্যের গভীরতম অন্তরে প্রবেশ করেন না তাহা নহে তবে তিনি তত্ত্ব দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন হন না।

রবীন্দ্রনাথ কবি, শিল্পী এবং স্রষ্টা। তিনি তত্ত্বদর্শী দার্শনিক নহেন। তাহার কাব্যে তত্ত্ব, ভাবুকতা বা দার্শনিকতা আছে, তবে তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নাই, আছে জীবনোপলব্ধির ব্যগ্রতা, রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে যে জীবন আমাদের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত, সুরে সংগীতে, হাসিতে অশ্রুতে যে জীবন মুখরিত, তাহাই কবি চেতনার সামগ্রী, তথাপি প্রত্যেক কবিরই জগতে জীবনের দিকে তাকাইবার

একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তাহাই কবির জীবন দর্শন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যধারার মধ্যে তাহার জীবন দর্শনকে চিনিয়া লওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বৈক্যানুভূতির মূলে তাহার এই জীবন দর্শন। আমাদের এই খণ্ড জীবনের অন্তরালে এক মহান পুরুষের অবস্থিতি এবং এই বিশ্বজীবন ও মানবজীবন যে সেই অসীম, অখণ্ড, শাশ্বত নিত্য সত্তারই প্রতিবিম্বন এরূপ একটি দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রকাব্যে সুস্পষ্ট। এই মহান পুরুষের স্থিতিই কবির মধ্যে বিশ্বৈক্যানুভূতির ফল স্বরূপ। তবে তত্ত্বরূপে কবি ইহা কোথাও উপস্থাপিত করেন নাই। পরমপুরুষরূপে ঈশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের মধ্যে দিয়া তাহার আত্ম প্রকাশ—ইহা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির সামগ্রী, সুদীর্ঘ কাব্যধারার মধ্য দিয়া কবি জীবন ও বিশ্বজীবনকে যতই জানিতে চাহিয়াছেন ততই তাহার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে। কবির এই বিশ্বোপলব্ধির সহিত জার্মান দার্শনিক হেগেলের দার্শনিক মতবাদের একটা মিল আবিষ্কার করা যায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

হেগেলের অদ্বৈতবাদকে বুঝিতে হইলে এবং সেই দার্শনিক মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের সামঞ্জস্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে হেগেলের দার্শনিক মতবাদটিকে সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন এবং হেগেলের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের সহিত হেগেলের দার্শনিক মতবাদের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করা প্রয়োজন। হেগেল একজন প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিক প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিক মাত্রেই ভাববাদী সার্ব্বিক দার্শনিক, (Idealistic universal. Philosopher) এই প্রজ্ঞানবাদী দর্শন এবং ভাববাদী সার্ব্বিক দর্শনের স্বরূপটি যদি অবহিত হওয়া যায় এবং জার্ম্মানীর কল্পনাবাদী দার্শনিকদিগের (Romantic Philosophy) চিন্তাধারাটিকে জানা যায় তাহা হইলে হেগেলের দার্শনিক মতবাদের স্বরূপটি জানা যাইবে।

প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিকদিগের মতে সত্য (Reality এক এবং অখণ্ড। ইহা প্রজ্ঞানগম্য। প্রজ্ঞানের (Reason) সাহায্যেই ইহাকে উপলব্ধি করা যায়, ইহা ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে। যাহা বিশেষ কালে ও বিশেষ স্থানে অবস্থিত তাহাই ইন্দ্রিয়লব্ধ। কিন্তু যেহেতু এই সত্য সার্ব্বিক (Universal) ইহা বিশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা একমাত্র প্রজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞেয়। ভাববাদী দার্শনিকদিগের মতে এই সত্য মনঃস্বরূপ। কারণ ভাববাদী দার্শনিক মন ও চিৎশক্তিকেই জগতের মূলতত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন, জড়শক্তিকে নহে।

জগতের আদিম উপাদান বা আদি-কারণকে জানার প্রচেষ্টাই আমরা গ্রীক দর্শনের প্রথম যুগে লক্ষ্য করি। প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালেশ পৌরাণিক ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া এবং বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইয়া জলকেই আদিম উপাদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। থালেশের শিষ্য দার্শনিক আনেকজিম্যাণ্ডার "অসীম একটা কিছু" (the unlimited) আদিম উপাদান বলিয়া স্বীকার করিলেন। যেহেতু জল একটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ তাহা বিশাল জগতের আদি কারণ রূপে অভিহিত হইতে পারে না। এই অসীম একটা কিছু অনির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বিশেষ। এবং সসীমের ব্যাখ্যার জন্য অসীমের প্রয়োজন পরবর্তী দার্শনিক আনেক্জামেনিস বায়ুকেই জগতের আদি-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এই তিনজন দার্শনিকের মধ্যে কেহই জগতের আদিম উপাদানের অন্বেষণে ভৌতিক পদার্থ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। দার্শনিক পাইথাগোরাসের মতে জগতের মূল উপাদান

সংখ্যা (number)। এবং এই সংখ্যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বুদ্ধিগ্রাহ্য।

ইলীয়েটিক দার্শনিকদিগের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম আমরা সার্ব্বিক ও প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের বীজটি আবিষ্কার করি। ইলীয়েটিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইলীয়া নিবাসী জেনোফেনিস বহু দেববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। এক ও বহু, নিত্য ও অনিত্য, সার্ব্বিক ও বিশেষ এই দ্বন্দের মীমাংসায় ইলীয়েটিক দার্শনিকগণ নিজেদের নিযুক্ত করিলেন। জেনোফেনিসের মতে একই জগতের মূলতত্ত্ব, তাহার মতে এই "একই" ঈশ্বর। কিন্তু দ্বিতীয় ইলীয়েটিক দার্শনিক পারমেনাই-ডিস তাহার নাম দিলেন সত্তা (Being) এই সত্তা এক ও অখণ্ড, ইহা চিরন্তন এবং দেশ ও কালের অতীত। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহুত্বের অনুভূতি লাভ করি, কিন্তু এই অনুভূতি ভ্রান্ত। এই সত্বা পরিবর্ত্তনহীন। কাজেই গতি, পরিবর্ত্তন, কাল সকল কিছুই অলীক মায়া। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। এই সত্বাই একমাত্র সত্য, ইহা ইন্দ্রিয়গম্য নহে, প্রজ্ঞানগম্য। এইভাবে পারমেনাইডিস সত্তার প্রত্যয়ের মধ্যে সার্ব্বিক সত্যের সন্ধান পাইলেন এবং জেনোফেনিসের ঈশ্বরের স্থলে এই সনাতন, পরিবর্ত্তনহীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সোফিষ্টদিগের দার্শনিক মত ইলীয়েটিক দার্শনিক-দিগের মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাহাদের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই সত্য জ্ঞান। শুদ্ধসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা, দার্শনিকের কষ্ট কল্পনা মাত্র, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষেরই অস্তিত্ব আছে, বিশেষকে অতিক্রম করিয়া কোন সার্ব্বিকের অস্তিত্ব নাই, মানবের ব্যক্তিগত জ্ঞানই যাবতীয় বিষয়ের বিচারে মানদণ্ড। ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাহার নিকট সত্য এবং সংবেদনই (Sensation) ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয়, শুদ্ধ সত্তাকে জানা অসম্ভব। সক্রেটিস সোফিষ্টদিগের এই মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন যে যদি প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া অভিহিত করা হয় তবে সত্যের বস্তুগত কোন মানদণ্ড থাকে না। ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের অস্তিত্বের ধারণা করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই প্রজ্ঞাই জ্ঞানের ভিত্তি, সামান্য প্রত্যয়ের (Cencept) সাহায্যেই সত্যকে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। এই সামান্য প্রত্যয় বুদ্ধিগ্রাহ্য, সামান্য প্রত্যয়ের সাহায্যেই জ্ঞান সম্ভব। সংবেদনের সাহায্যে জ্ঞান সম্ভব নহে। প্লেটোও প্রোটাগোরাসের মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মতে প্রত্যক্ষ অনেক স্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, কালভেদে এই প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সুতরাং জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিন্ন নহে। যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে প্রজ্ঞাহীন মনুষ্যের সহিত পশুর কোন পার্থক্য নাই। তাহা ভিন্ন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রজ্ঞার কার্য্য আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নহে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষজ্ঞানের একটি প্রত্যক্ষপূর্ব্ব অংশ আছে। তাহাকেই প্লেটো প্রত্যয় (Ideas) বা সামান্য (universals) বলিয়াছেন। সমস্ত জ্ঞানই সার্ব্বিক। ইহা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রজ্ঞার সাহায্যেই জানা যায়, প্লেটো সক্রেটিসের সামান্য প্রত্যয়কে দিলেন এক বাস্তব সত্তা এবং এই বাস্তব সত্তাময় সামান্য প্রত্যয়ের নাম দিলেন প্রত্যয়। ব্যবহারিক জগতে এই সকল প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নাই। ইহাদের অস্তিত্ব দেশকালের অতীত এক অতীন্দ্রিয় জগতে। ইহারা সনাতন, নিত্য, অচল ও স্থাণু। ইহাই প্লেটোর সামান্যবাদ (Ideal theory) নামে অভিহিত।

আরিষ্টটল কোন অতীন্দ্রিয় জগতে সার্ব্বিক

সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে প্লেটোর সামান্য জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে সামান্যদিগের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কোন বস্তু হইতে তাহার সামান্যকে স্বতন্ত্র করা যায় না, আরিষ্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তুরই রূপ এবং উপাদান আছে। রূপ এবং উপাদান একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র চিন্তায় তাহাদের পৃথক করা চলে। ঈশ্বর উপাদান বিবর্জ্জিত রূপ বা অন্তিম রূপ (matterless form)। তাহাতে কোন উপাদানের অস্তিত্ব নাই। এবং অস্তিত্বের সর্ব্বনিম্নে আছে রূপহীন পদার্থ (formless matter)। আরিষ্টটল দ্বৈতবাদী কাজেই উপাদান ও রূপ উভয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। এই দ্বৈত অখণ্ডনীয়, উপাদানের মধ্যেই তার গুণগত রূপটি প্রচ্ছন্ন (potential) হইয়া থাকে। তাহাই বাস্তবতা (actual state) লাভ করে। প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে মূর্ত্তির গুণগত রূপটি। মূর্ত্তিটির সৃষ্টির মধ্য দিয়া ঐ গুণগত রূপটি প্রকাশিত হইল বা বাস্তবতা লাভ করিল। উপাদান গুণগত রূপের প্রচ্ছন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরই জগতের পরিণাম এবং সেই লক্ষ্যের অভিমুখে যাবতীয় বস্তু ধাবিত হইতেছে, জগতের সমস্ত কার্য্যের অন্তিম কারণ ঈশ্বর। জগত ঈশ্বর অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আরিষ্টটল অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক এবং গতিকে তাহার দর্শনে বিশেষ স্থান দান করিয়াছেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য জগত অবিশ্রাম গতিতে ধাবিত হইতেছে। সেই উদ্দেশ্য হইল প্রজ্ঞার পূর্ণতম প্রকাশ, ঈশ্বরের মাঝেই এই প্রজ্ঞার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। তাই অপূর্ণ জগত ঈশ্বরকে লাভ করিয়াই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার বাসনা করে।

হেগেলীয় দর্শন, প্রজ্ঞাবাদী ও ভাববাদী প্লেটো ও আরিষ্টটলের গ্রীক দর্শনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আরিষ্টটল প্রচ্ছন্ন অবস্থা (potential state) এবং বাস্তব অবস্থা (actual state) স্বীকার করিয়াছেন। রূপের উদ্দেশ্যেই দ্রব্যের গতি। রূপই তাহার গতির কারণ। রূপ প্রাপ্তিতে গতির শেষ। বৃক্ষরূপ ধারণ করাই বীজের উদ্দেশ্য। উহাতেই তাহার গতি। কাজেই বৃক্ষ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বীজের মধ্যে বর্ত্তমান এবং বীজের বৃক্ষরূপ অবস্থায় পরিণত হওয়ার অর্থই প্রচ্ছন্ন অবস্থার বাস্তব আকার ধারণ করা। হেগেল ও আরিষ্টটলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন অবস্থাকে অপ্রকাশিত ভাবে (emplicit) এবং বাস্তবতাকে প্রকাশিত ভাব (explicit) বলিয়াছেন। যে জগত অদ্বৈতের মধ্যে অপ্রকাশিত ছিল বিশ্বজগতের আকার লাভ করিয়া তাহা প্রকাশমান হইয়াছে। অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে প্রকাশিত অবস্থার মধ্যে আসাই ক্রমবিকাশ এবং আরিষ্টটল ও হেগেল উভয়েই এই ক্রমবিকাশকে স্বীকার করিয়াছেন। আরিষ্টটলের মতে ক্রমবিকাশ অর্থ প্রচ্ছন্ন অবস্থা হইতে বাস্তবতায় আসা এবং হেগেলের মতে অপ্রকাশিত ভাব হইতে প্রকাশিত ভাবে আগমন করা। আরিষ্টটল অস্তিত্বের সর্ব্বোচ্চস্তরে ঈশ্বরকে স্থাপন করিয়াছেন ইহা হইল অন্তিম রূপ, ইহা হইল প্রজ্ঞানের প্রজ্ঞান। যেহেতু ঈশ্বর উপাদান বিবজ্জিত অন্তিম রূপ—তিনি পদার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। প্রজ্ঞানই তার চিন্তার বিষয়। ঈশ্বর নিজেই তাহার চিন্তার বিষয়। ঈশ্বর আত্মজ্ঞ। হেগেলের অদ্বৈতও প্রজ্ঞার প্রজ্ঞা এবং আত্মজ্ঞ। আরিষ্টটল যাহাকে অন্তিম রূপ বা পূর্ণ সার্ব্বিক রূপ (form of forms) বলিয়াছে। আবার তাহাকেই প্রজ্ঞার প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। ইহা সম্ভব যদি রূপ অর্থে আমরা প্রজ্ঞাকেই বুঝি। কাজেই

প্রজ্ঞাই সার্ব্বিক এবং এই সার্ব্বিকই সত্য এবং অদ্বৈত। এবং যেহেতু প্রজ্ঞান মনের ধর্ম্ম অদ্বৈত, প্রজ্ঞাকে অদ্বৈত মনও বলা চলে। ইহা ব্যক্তিমন নহে, সার্ব্বিক মন (universal mind)।

প্রশ্ন হইল রূপ অথবা সামান্য কি প্রজ্ঞা? রূপই যে প্রজ্ঞা ইহাই আরিষ্টটল এবং হেগেলের মত। ভাববাদী দার্শনিকদিগের মতে সামান্য বা সার্ব্বিক রূপ (universal forms) সমূহ বিশ্লিষ্ট (abstract)। ইহারা ব্যক্তিমনের ধারণার উপর নির্ভরশীল নহে। ইহাদের নৈয়ায়িক সত্তা (logical being) আছে জাগতিক সত্তা নাই। চিন্তা ব্যক্তিমনের উপর নির্ভরশীল। মননশীল কর্ত্তার অস্তিত্ব ভিন্ন চিন্তার কথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সার্ব্বিক রূপ সমূহের অস্তিত্ব নাই। ইহারা দেশ-কালের অতীত। ভাববাদীরা যখন অদ্বৈতকে মন বলেন তখন তাহার অর্থ যে উহা সার্ব্বিক মন। এ সার্ব্বিক অদ্বৈত মনই জগতের কারণ। (reason or ground) জগতের সহিত এই অদ্বৈত নৈয়ায়িক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

আরিষ্টলের মধ্যে দিয়াই গ্রীক দর্শন লাভ করিল তাহার চরম পরিণতি। আরিষ্টটলের পরবর্ত্তী তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায় ষ্টোয়িক (stoic), এপিকিউ-রিয়ান (epicurean) ও স্কেপটিক (sceptic) আরিষ্টটলের এই ভাববাদকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে দে কার্ত্ত (Des Cartes) হইতে লাইবেনিজ পর্যন্ত যে দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে তাহা হেগেলের দর্শনকে শেষ প্রভাবান্বিত করে নাই। তবে ইমানুয়েল কান্টের দার্শনিক মতবাদের সহিত হেগেলীয় দর্শনের যোগসূত্রটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন কান্টের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন দার্শনিক হেগেলীয় চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা হইল ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদ।

হেগেলের ন্যায় স্পিনোজাও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু স্পিনোজার অদ্বৈত নির্গুণ। স্পিনোজার মতে কোন পদার্থকে কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিলেই তাহাতে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় (All determination is negation)। হেগেলের মতে অস্বীকার করিলেই তাহাতে স্বীকৃতি আরোপ করা হয়। স্বীকৃতির মধ্যে যেমন অস্বীকৃতি আছে, ঠিক তেমনিই অস্বীকৃতির মধ্যেও স্বীকৃতি আছে। স্বীকার করা মানেই অস্বীকার করা। ইহা স্পিনোজার তত্ত্ব এবং অস্বীকার করা মানেই স্বীকার করা ইহা হেগেলের তত্ত্ব। হেগেলের অসীমের ধারণাও স্পিনোজার অসীমের ধারণার অনুরূপ নহে। স্পিনোজার মতে যাহা অসীম তাহা সগুণ হইতে পারে না। কারণ গুণের আরোপ করার অর্থই হইল অসীমকে সীমাবদ্ধ করা। তাই Spinozar ঈশ্বর বা substance শূন্যতারই নামান্তর। কিন্তু হেগেলের অদ্বৈত স্পিনোজার শূন্যগর্ভ ঈশ্বর নহে। কারণ হেগেল নির্গুণ অদ্বৈতকে স্বীকার করেন না। হেগেলের অদ্বৈত সকল দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধন করে। বহুর উর্দ্ধে ইহার অবস্থিতি নহে। বহুকে সমন্বিত করে বলিয়াই ইহা অদ্বৈত। ইহা ভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতির বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান। স্পিনোজার দার্শনিক পদ্ধতি জ্যামিতিক (geometrical)। হেগেলের দ্বান্দ্বিক, (dialectical)।

সংক্ষেপে আমরা ভাববাদী বা প্রজ্ঞাবাদী গ্রীক দর্শনের স্বরূপটি লক্ষ্য করিলাম এবং হেগেলের সহিত তাহার যোগসূত্রটি কোথায় তাহাও আবিষ্কার করিলাম। স্পিনোজার সহিত হেগেলের দার্শনিক মতবাদের পার্থক্য ও মিল লক্ষ্য করা গেল। বর্ত্তমানে

অতি সংক্ষেপে আধুনিক ভাববাদের স্বরূপটি লিপিবদ্ধ করিব, তাহা হইলেই হেগেলের অদ্বৈত-বাদের স্বরূপটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল জ্ঞানের উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগিয়া উঠে তাহা হইল জ্ঞানের বিষয়বস্তু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানতঃ দুই প্রকার মতবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। বস্তুবাদ এবং ভাববাদ (Realism and Idealism)। সাধারণ বস্তুবাদ (Naire Realism) বস্তুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক বলেন প্রত্যয়ের সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। এই প্রত্যয় দুই প্রকার। সরল ও যৌগিক। যে কোন দ্রব্যের দুই প্রকার গুণ আছে। মুখ্যগুণ (primany qualities) এবং গৌণগুণ (secendary qualities)। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উষ্ণতা প্রভৃতি মুখ্যগুণ। এগুলি মনঃ নিরপেক্ষ (objective)। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ এগুলি গৌণগুণ। এগুলি মনের সৃষ্টি। (subjective)। সাধারণ বস্তুবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের (scientific realism) এখানেই পার্থক্য। সংবেদন (sensation) এবং অন্তর্দৃষ্টির (reflection) সাহায্যে আমরা প্রত্যয়কে জানি না এবং এই অন্তু-রূপ প্রতিনিধির মাধ্যমেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব। গৌণগুণগুলির সহিত জড়জগতের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যয়গুলি স্বয়ং প্রতিষ্ঠ নহে। ইহাদের প্রতিষ্ঠ স্বরূপ একটি স্বয়ং প্রতিষ্ঠ পদার্থের (substance) কল্পনা করা হয়। বিশপ বার্কলে গৌণগুণ ও মুখ্যগুণের পার্থক্য স্বীকার করেন না। উভয়েই সংবেদন। উভয়েরই কোন বাস্তব সত্তা নাই। কাজেই কোন স্বয়ং প্রতিষ্ঠ পদার্থ (substance) নাই। মন হইতে স্বতন্ত্র বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই। আমরা কেবলমাত্র সংবেদনকেই জানিতে পারি। এগুলি মনের সৃষ্টি। ইহাই ভাববাদ। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ভাবরূপে বা ধারণারূপে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কাজেই চেতনার বহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। (Esse is percipi)। কিন্তু জ্ঞাতার ভাবধারা ভিন্ন যদি কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে জ্ঞাতার অনুপস্থিতিতে বস্তুটির অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে? বার্কলে অন্য মননশীল কর্তা (finite mind) এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মনের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন। কিন্তু বার্কলের মতের সমালোচনা করিয়া Hume দেখান যে যেহেতু বার্কলের পক্ষে নিজ মনের অস্তিত্ব ভিন্ন অপর কোন মনেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে, তাহার দার্শনিক মতবাদের অনিবার্য ফল হইল আত্মসর্ব্বস্ববাদ (solipsism)। অর্থাৎ আমি এবং আমার ধারণাই একমাত্র সত্য।

আত্ম-সর্ব্বস্ববাদের পরিণতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র মানসজগৎ লইয়া তৃপ্ত রহিলে চলিবে না। কান্ট এই সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং চেতনাতীত এক অজ্ঞাত সত্তাকে (thing in itself) বহির্জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কান্টের মতে আমাদের জ্ঞান মায়িক (phenomenal)। পারমার্থিক নহে, কারণ পার-মার্থিক সত্তা চেতনাতীত সত্তা (transcendental) কিন্তু এই চেতনাতীত সত্তাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায় না। ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমাদের জ্ঞান বাহ্যজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কান্টের মতে জ্ঞানের উপাদান দ্বিবিধ। (১) সংবেদন এবং জ্ঞান-সূত্র (Categories of knowledge)। এই জ্ঞান সূত্রগুলি প্রাকসিদ্ধ। (apriori)। জ্ঞানসূত্রগুলি

সংবেদনকে সংবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। যে জগৎকে আমরা জানি তাহা আমাদের বুদ্ধি নির্মিত। এই জগতকে অতিক্রম করিয়া বস্তুর অনন্ত রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব নহে।

ফিকৃটে, শেলিং এবং হেগেল অদ্বৈতবাদী, কাণ্টের এই দ্বৈতবাদকে তাহারা স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতানুসারে কাণ্টের মত স্ববিরোধ দোষে পুষ্ট। কাণ্ট চেতনাতীত সত্তাকে জগতের কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা জ্ঞানের অতীত তাহার উপর জ্ঞানের সূত্রগুলি আরোপ করা চলে না। কারণ জ্ঞানসূত্রগুলি কেবলমাত্র মায়িক জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফিকৃটে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক। তিনি অহংরূপী আত্মজ্ঞ ইচ্ছাশক্তিকে (self conscious will) চরম বাস্তব (realilty) বলিয়া অভিহিত করেন। অহংকে মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা তিনি জগতের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। অহং(ego) অংশত আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া অনাত্মার (non-ego) সৃষ্টি করে। অচেতন আত্মা বা অনাত্মা হইতেই জগতের সৃষ্টি। জ্ঞানের রাজ্যে আত্মা এবং অনাত্মার বিরোধ বর্ত্তমান। বাহ্যজগৎ আত্মার দ্বৈতরূপ। কিন্তু ফিকৃটে আমাদের এই সংকীর্ণ ব্যক্তিগত মনকেই অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ফিকৃটের মতবাদ খণ্ডন করিয়া শেলিং বলেন যে অচেতন আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। যাহা অচেতন তাহার সৃষ্টিক্ষমতা নাই। তাহার মতে ইচ্ছাশক্তিরূপ আত্মা দ্বন্দ্বাতীত নহে। জ্ঞেয় জগৎ ও জ্ঞাতা পরস্পর সাপেক্ষ। অচেতন আত্মা এবং অহং কোনটিই অদ্বৈত নহে। অদ্বৈত পরম সত্য দ্বন্দ্বাতীত।

হেগেলের অদ্বৈতবাদের মধ্যে তাহার পূর্ব্ববর্তী দার্শনিকদিগের চিন্তাধারার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। যাহা অদ্বৈতের অংশ মাত্র তাহাকেই ফিকৃটে অদ্বৈত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শেলিং অদ্বৈতকে দ্বন্দ্বাতীত সত্তা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ফিকৃটের অহংরূপী আত্মা অনাত্মার সহিত দ্বন্দরত। তাহা অদ্বৈত হইতে পারে না,—শেলিং-এর অদ্বৈত দ্বন্দের বাহিরে অবস্থিত। ইহা নির্গুণ। কিন্তু হেগেলের অদ্বৈত সকল দ্বন্দের সমন্বয়। ইহা আত্মিক (spiritual)

হেগেলের দর্শনে চরম সত্তা প্রজ্ঞান স্বরূপ। কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞান মায়িক। হেগেলের মতে আমাদের জ্ঞান মায়িক নহে, হেগেলের কাণ্টের চেতনাতীত সত্তা (thing-in-itself) স্বীকার করেন না। হেগেলের মতে চেতনাতীত সত্তাই চেতনার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, তাহা চেতনাতিরিক্ত কিন্তু চেতনাতীত নহে। হেগেলের মতে যাহা বাস্তব তাহাই প্রজ্ঞানগম্য, (whatever is real is rational)। অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বলিয়া কোন কিছুকেই হেগেল স্বীকার করেন নাই, এই বিশ্বে এমন কিছু নাই যাহা মানব মনের নিকট জ্ঞেয় নহে।

হেগেলের অদ্বৈত মনঃস্বরূপ। কিন্তু এই মন ব্যক্তিগত মন নহে। ইহা সার্ব্বিক মন বা বিশ্বমন। হেগেল দ্বান্দিক পদ্ধতির সাহায্যে তাহার দার্শনিক মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গতিশীলতা হেগেলীয় দর্শনে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। দ্বন্দতত্ত্ব অনুসারে মানুষের ধারণা (concept) একটি অন্তর্নিহিত গতির প্রভাবে ইহার বিপরীত ধারণাতে পরিণত হয় এবং উভয় ধারণাই পরে একটি উচ্চতর ধারণার মধ্যে সমন্বয় লাভ করে, মানবের চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতে, জগতের অভিব্যক্তিতে, মানব ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে সর্ব্বত্রই এই বিপরীত দ্বন্দ বর্ত্তমান। এই দ্বান্দিক পদ্ধতির তিনটি স্তর বর্ত্তমান। প্রথমটি

প্রস্তাব (thesis)। দ্বিতীয়টি বৈপরীত্য (anti-thesis) এবং তৃতীয় স্তরটি সমন্বয় (synthesis)। সমন্বয়ের মধ্যেই চিন্তাধারা সমাপ্তি লাভ করে না,—সমন্বয়কে নূতন প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করিয়া চিন্তাধারা অগ্রসর হইতে থাকে।— চেতন ও অচেতন আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহারা সমজাতীয়, এবং একই অদ্বৈত উভয়ের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। কারণ তাহারা একই অদ্বৈতের ভিন্ন রূপ মাত্র।

হেগেলের অদ্বৈত প্রজ্ঞান স্বরূপ, এবং ইহাই আবার সার্ব্বিক মন। ইহাই জগতের অন্তর্নিহিত কারণ স্বরূপ, জগতের যাবতীয় বস্তু পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, এই অদ্বৈত সকল সম্পর্কের ভিত্তি স্বরূপ। বিশেষের মধ্য দিয়াই এই অদ্বৈতের আত্মপ্রকাশ, ন্যায়তঃ এই অদ্বৈত বিশেষের পূর্ব্ব-গামী,—

হেগেলের পরম সত্তা অদ্বৈত নির্গুণ নহে, সগুণ। সৃষ্টিধারার মধ্যে আমরা বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করি। জড় জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনুষ্য জগৎ প্রভৃতি এই সৃষ্টিধারার বিভিন্ন স্তর। হেগেলের অদ্বৈত কেবলমাত্র মানবের মধ্য দিয়া নহে, জড়-বস্তু, প্রাণী, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকল কিছুর মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বাহ্যতঃ যত পার্থক্যই দেখি না, একই অদ্বৈত তাহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সগুণ জগতের মধ্য দিয়াই অদ্বৈতের প্রকাশ। তাহার উদ্দেশ্য হইল সীমার মধ্যে অসীমকে প্রকাশ করা। হেগেলের মতে অদ্বৈত সৃষ্টি ভিন্ন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ। আমাদিগের জ্ঞান, আমাদিগের বুদ্ধি, আমাদিগের চিন্তা অদ্বৈতেরই চিন্তা,—অদ্বৈতের অনন্ত অসীম জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে। কাজেই এই অদ্বৈত অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নহে। বিশ্বের মধ্যে যে ক্রমবিকাশের ধারা আমরা লক্ষ্য করি তাহার মূলে আছে গতি। কিন্তু এই গতি অদ্বৈত হইতেই উদ্ভূত হইয়া তাহাতেই প্রত্যাগত হয়।

হেগেল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ কবি। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে দেখি না তাহা নহে, তবে সেই দার্শনিক বাস করেন কবি মনের অন্তরালে। কাজেই হেগেলের দার্শনিক মতবাদটিকে যথাযথ রবীন্দ্র কাব্যে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা সার্থক নহে যুক্তিযুক্তও নহে। তথাপি এই খণ্ড জীবন ও বিশ্ব জীবনকে কবি যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার সহিত হেগেলের চিন্তাধারার একটা মিল ও সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। হেগেলের যুক্তির মধ্য দিয়া যাহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন অনুভূতিপ্রবণ কবি অনুভূতির মধ্য দিয়াই তাহাকে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। হেগেলের অদ্বৈত বা Absolute বিশ্ব-জীবনের অতিরিক্ত হইলেও বিশ্বজীবনের অতীত নহে। এই অদ্বৈত একসঙ্গে immanent ও transcendent, হেগেলের মতে সৃষ্টি ব্যতীত অদ্বৈতের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ অদ্বৈত নির্গুণ নহে, সগুণ—কেবল মানবের মধ্য দিয়া নহে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, তৃণ, লতা, পুষ্প সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তাহার আত্মপ্রকাশ। সৃষ্টিধারার এই বৈচিত্র্য অদ্বৈতেরই ভিন্ন রূপ মাত্র, আমাদের মধ্য দিয়াই সসীম অসীমের রূপ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ হেগেলের পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বকে গ্রহণ করেন নাই। খণ্ড মানব জীবন ও

বিশ্বজগত সত্য। কারণ তাহাদের মধ্য দিয়াই বিশ্বদেবতার প্রকাশ, এই বিশ্বদেবতা এবং তাহার সৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৃষ্টি ছাড়াও স্রষ্টার সত্তা আছে। এই সত্তা সৃষ্টির বাহিরে থাকিয়াও সৃষ্টির ভিতরে বর্ত্তমান। হেগেলের অদ্বৈতের ন্যায় একসঙ্গে immanent ও transcendent তবে রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব কবি-দিগের লীলাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বদেবতা বা ভগবানের আত্মপ্রকাশের জন্য, লীলা-বিলাসের জন্যই এই সৃষ্টি। তাহারই লীলার আনন্দ সৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতেছে।

সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম সুর, খণ্ড জীবনের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে চিরন্তন জীবন, সেইজন্য কবি এক অখণ্ড সত্তা তাহার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহার অখণ্ড প্রকাশে আবার অখণ্ড আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আত্মোপলব্ধি করিতেছে খণ্ডের মধ্য দিয়া।

……"অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

অন্যত্রও কবি বলিয়াছেন "বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।" জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ এক মহান বিশ্ব-পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন। এই বিশ্বপুরুষ কবিকে এবং এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। কবি জীবনের মধ্য দিয়া এবং এই বিশ্বজীবনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করার মধ্যেই তাহার সার্থকতা Religion of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever widening individuality."

এই যে ব্যক্তি জীবনের মধ্য দিয়া, এবং বিশ্ব-জীবনের মধ্য দিয়া এক পরম পুরুষের আত্মপ্রকাশ, সীমার মধ্য দিয়া অসীমের আত্মোপলব্ধি ইহার মধ্য দিয়াই মানব জীবন ও বিশ্বজীবন এক গভীর অর্থ লাভ করিয়াছে। সেই পরম পুরুষের সত্তা ব্যতীত সৃষ্টির কোন সত্য নাই। সৃষ্টিকে বাদ দিয়া সেই স্রষ্টা শূন্যগর্ভ। এই সীমাবদ্ধ সৃষ্টি অসীমেরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কোন এক অনাদিকাল হইতে স্রষ্টা এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে করিতে, কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন, উত্থান পতন, হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, কত বৈচিত্র্য পূর্ণ রহস্যের মধ্য দিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারা ভবিষ্যতের পথে ধাবিত হইতেছে। মানব জীবনও ছুটিয়া চলিয়াছে একটি পূর্ণতার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া পরিপূর্ণ বিকাশের পথে। রবীন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধির মূলে আছে চলিষ্ণুতা, ব্যক্তিজীবন বিশ্বজীবনের সহিত একযোগে একটা প্রকাশের পথে ধাবিত হইতেছে।

তাই কবি বলেন—

"জানি কোন আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।"

কবির মুখে আবার শুনিতে পাই—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।"

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"বাহির হলেম কবে সে নাই মনে
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে!"

"আত্ম-পরিচয়" পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধে কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি জানি। অনাদি

কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

কবির এই আত্মোপোলব্ধি কত গভীর। তাই না কবি বলেন—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এ ভবে।"

হেগেল মায়াবাদী দার্শনিক নহেন। এই সৃষ্টিকে সত্য বলিয়াই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও মায়াবাদী দার্শনিক নহেন, তাই এই জীবনকে মায়া বলিয়া কবি ইহাকে অস্বীকার করেন নাই। জীবন রসিক কবি, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় আকুল কবি জীবন-উপভোগের আনন্দকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সোনার তরী কাব্যে "মায়াবাদ" কবিতায় কবি এই মায়াবাদী-দের প্রচ্ছন্ন ধিক্কার দিয়াই যেন বলিতেছেন—

"লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা ;
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলে খেলা।"

কিন্তু আরও এক কারণে কবি জগতের এই সমস্ত সৌন্দর্য্যকে ক্ষণিক জানিয়া, মানবজীবনকে নিরর্থক মনে করিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কবির এই জীবন অনুরাগ সৃষ্টিরহস্যের বহির্দিকটিকে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, জীবনরহস্যের, সৃষ্টি-সত্যের আরও গভীরে কবি প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের এই জীবন চঞ্চল এবং ক্ষণিক। জীবনকে বেষ্টন করিয়া যে হাসি অশ্রু তাহাও চঞ্চল। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের কোন সার্থকতা নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই যে জীবন-দর্শন তাহা আংশিক, তাই তাহা অসার্থক ও অসত্য। এ জীবন দর্শনের মধ্যে বিশ্বজীবনের কোন উপলব্ধি নাই। সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্রষ্টা, বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বদেব, তাকে জানায় প্রচেষ্টা নাই। পার্থিব জীবনের দিকে তাকাইলে মনে হয় এ জীবনের সকল কিছুই অপূর্ণ। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, "পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।" সৃষ্টির মধ্য দিয়াই স্রষ্টার বিকাশ, স্রষ্টার আত্মপোলব্ধি, এ সত্য উপলব্ধি করিবার পরে এই খণ্ডজীবনও এক নূতন মাধুর্য্য লইয়া চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। আমার এই ব্যক্তি জীবনের অন্তরালে এক বিশ্বপুরুষ, এক বিশ্বদেবতা, আমার জীবনের সকল অভিজ্ঞতা ও সকল অনুভূতিকে যে এক ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করিতেছেন, সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেছেন, এই জীবনবোধই কবির মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে এই সুদৃঢ় প্রত্যয় যে এ জীবন মায়া নহে, এ প্রবহমান সৃষ্টি মিথ্যা নহে। ইহাদের অন্তরালে বিরাজ করিতেছে এক গভীর রহস্য, গভীর আত্মোপলব্ধির মধ্যেই এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

হেগেল তাহার দর্শনে গতিকে স্বীকার করিয়াছেন। হেগেলের মতে বিশ্ব বেগবান, অদ্বৈতও জীবন্ত বেগবান সত্তা।—জীবনের মূলধর্মরূপ রবীন্দ্রনাথও এই গতিকে স্বীকার করিয়াছেন। কবি তাহার কাব্য-জীবনের মধ্যক্ষণে খণ্ডজীবনের উপভোগকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। গতি নহে, স্থিতিই যেন কবির কাম্য, কিন্তু জীবনের পথে কবি যতই অগ্রসর হইয়াছেন, কবির এই বিশ্বাস ততই দৃঢ় হইয়াছে যে জীবনে গতিই সত্য, জীবনে গতিই প্রাণ, স্থিতিই মৃত্যু। বলাকা যুগে কবির কাব্যে সৃষ্টির মধ্যে এই বিশ্বাসই ধ্বনিত হইয়াছে। কবি যেন সৃষ্টির দিকে তাকাইয়া সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উপলব্ধি করিলেন। গতিই জীবনের ধর্ম, গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির প্রকৃত প্রকাশ। জীবনের স্থিতিতে নহে, গতিতে, কবি অনুভব করিলেন সৃষ্টির

মধ্য দিয়া নিরন্তর পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে। চলমান গতিপ্রবাহের মধ্যেই সৃষ্টির সত্য নিহিত। নব নব রূপান্তরই সৃষ্টির সত্য রূপ।

"মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"

কিন্তু এই গতি কি কেবলমাত্র ভাসিয়া চলা বা ছুটিয়া বেড়ান? প্রথমে কবি এই গতির মূলে কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পান নাই। "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।" নিরন্তর চলার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, এই ছিল কবির উপলব্ধি। সকল সঞ্চয় ফেলিয়া দিয়া আগাইয়া চলিতে হইবে এই ছিল কবির ধারণা।

"তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাসনে ফিরে।

কিন্তু কবি ক্রমশঃ উপলব্ধি করিলেন যে এই গতি, এই প্রাণাবেগ উদ্দেশ্যহীন নহে, ইহা গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ, গতির আনন্দে মুগ্ধ না হইয়া কবি এই গতির বাহিরেই একটি স্বতন্ত্র সার্থকতার সন্ধান পাইলেন। তাহা হইল সেই পরম পুরুষের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা, তাহার সহিত মিলনের জন্যই কোন আদি যুগ হইতে এক অজ্ঞাত গভীর আশায় এ জীবনের ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে। এই গতিধর্ম্ম কবির ভিতর সমগ্রতাবোধ জাগাইয়াছে।

…"আমির আমার ধারা মিলে যেথা
যবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।

হেগেলের মতে যে অদ্বৈত হইতে এই জগৎ ও জীবন উদ্ভূত, গতির প্রভাবে সেই অদ্বৈতেই তাহা প্রত্যাগত হয়। যে পরিপূর্ণ চৈতন্য হইতে কবির ব্যক্তি চৈতন্য উদ্ভূত, সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যের মধ্যেই তাহা আবার প্রত্যাগত। দার্শনিক হেগেল যুক্তি দিয়া যাহাকে বুঝিয়াছিলেন, কবি অনুভবের মধ্য দিয়াই তাহাকে উপলব্ধি করিলেন। তাই বিশেষ কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গীর সমগ্রতা এবং ব্যাপকতা আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ব-জীবনোপলব্ধির মূলে। কবির অনুভূতি এবং দার্শনিকের তত্ত্বদৃষ্টি দুই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি দিক

শ্রীকৌশাম্বীনাথ মল্লিক এম-এ (ইতিহাস), এম-এ (এডুকেশন), বি-টি
(অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা)

[লেখক ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৭ পর্য্যন্ত আমাদের কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র সঃ হী, ভ, স)]

ধর্ম্মই ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই যেমনটি ধর্ম্ম পারিয়াছে। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক দিকটাই ধর্ম্ম শাসিত ছিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তাধারায়, দৈনন্দিন কার্য্যাবলীতে এই ধর্ম্মমত ব্যক্ত হইত।

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা, ধর্ম্মেরই একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। এই শিক্ষা বেদশিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানের অর্থাৎ পরাজ্ঞানের দিকে পরিচালিত হইত। এই মরজীবনের অন্তে যে দিব্যজগৎ রহিয়াছে তাহারই উপলব্ধি প্রাচীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাই ছিল অমৃতত্ব—যা মৃত্যুঞ্জয় ও চিদানন্দময়। শিক্ষার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। ইহারই ফলে মানুষ এই মরজগৎ হইতে মুক্তি পাইতে সক্ষম হইত।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারায় ভারতীয়দের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহারা ঐহিক জীবনকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেন না। ইহারই মাধুর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিসমস্ত বিশ্বজনকে শুনাইয়াছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের ঋষিরা বলিয়াছেন, "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্।" যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এই অমৃতত্ব লাভ—অজ্ঞান অন্ধকারনাশী জ্ঞানই পরাজ্ঞান। এই জ্ঞানলাভই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ। জীবন ও মৃত্যু প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট চিরসত্য ছিল। একটি ছাড়া অন্যটি অপূর্ণ মনে হইত। এই চিন্তাধারা ইহজীবনের মূল্যায়নে সাহায্য করিয়াছিল। মৃত্যু তাহাদের নিকট ভীতিস্বরূপ ছিল না। ইহা ছিল অমৃতস্বরূপ। সে কারণে ইহজীবনের দিনগুলিতে মৃত্যুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক আর্য্যই মনে করিতেন মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ ঘটে না; ব্যক্তিদেহের মাত্র বিনাশ ঘটে। আত্মা পরমব্রহ্মের অংশবিশেষ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক ঐশী শক্তি রহিয়াছে। সেই ঐশী শক্তি সর্ব্বদাই পরমব্রহ্মের সহিত মিলনে ব্যগ্র। প্রত্যেকের মধ্যে এই মিলনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। শিক্ষা এই মিলনের বা মহামিলনের সেতুস্বরূপ গণ্য হইত। সে কারণে শিক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারার বা বস্তুবিশেষের জ্ঞানের বিশেষ স্থান ছিল না। "নিজেকে জানা"ই ছিল শিক্ষার মূল তাৎপর্য্য। যিনি নিজ জীবনে অনন্তের বা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন তিনি সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারিতেন।

যোগ বা যোগসাধনা এই শিক্ষাধারার মূল পদ্ধতি ছিল। ইহারই ফলে আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সম্ভব হইত। ইহা ব্যক্তিজীবনে আধ্যাত্মিক

উন্নতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আনয়ন করিত। বেদাধ্যয়নও এই পরাজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ছিল।

মরজগতে নশ্বরত্ব প্রাচীন ভারত বিশেষভাবে মানিয়া লইয়াছিল। পরাজ্ঞান লাভের বা পরমোপলব্ধির উপায় কখনই সম্ভব হইবে না যদি না মরজগতের সর্ব্বপ্রকার দান—মূলতঃ দৈহিক ও মানসিক কামনা বাসনা হইতে নিজেকে মুক্ত না রাখা যায়। সে কারণে শিক্ষাকালে দৈহিক ও মানসিক কামনা বাসনার দমনও শিক্ষনীয় ছিল। ইহারই জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

ব্যক্তিজীবনের চরম উন্নতি সাধনই প্রাচীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সে কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিপ্রভাব বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বড়ই মধুর ছিল। উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্বন্ধ আরম্ভ হইত। শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত এবং গুরুগৃহই ছিল বিদ্যালয় ভবন। দৈহিক সংযম ও সদভ্যাস শিক্ষার জন্য তাহাকে গুরুগৃহের যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হইত। ঋষিরা সাধারণতঃ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে তপোবনে সপরিবারে বাস করিতেন। শিক্ষার্থীকে গুরুর গোচারণ, যজ্ঞের জন্য শমীকাষ্ঠ সংগ্রহ কতিে হইত। ভিক্ষা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। এই ভিক্ষাদ্বারা তাহার অহমিকা, দম্ভ ইত্যাদি শাসিত হইত। ইহার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে নম্রতা, শিষ্টাচার, বশ্যতা প্রভৃতি সুগুণাবলী আয়ত্বে আসিত। শিক্ষার্থীকে মুণ্ডিত মস্তক অথবা জটাধারণ করিতে হইত। মস্তকে তৈল দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে হইত। প্রথমে বেদই ছিল একমাত্র পাঠ্য বিষয়। ইহাই আর্য্যদের প্রধান ও আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। ঋষিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের বাণী শুনিতেন বলিয়া ইহার আর এক নাম শ্রুতি। বেদের চারিভাগ আয়ত্ব করিতেই শিক্ষার্থীর সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত।

এই সময়ে লিখিত পুস্তকের কোন ব্যবহার ছিল না। গুরুমুখে শুনিয়া শিক্ষার্থীকে স্মৃতিতে পাঠ ধরিয়া রাখিতে হইত। ইহাকে বলা হইত শ্রবণ। তাহার পর উক্ত পাঠ পর্য্যালোচনা করিতে হইত। এই পদ্ধতিকে মনন বলা হইত। ইহার পর নিজ চিন্তাধারা পাঠের অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করিতে হইত। ইহাকে নিদিধ্যাসন বলা হইত। পরবর্ত্তীকালে বৈদিক সাহিত্য বিশাল আকার ধারণ করিলে এই শিক্ষাপ্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটে। উপনিষদগুলিতে এক নূতন শিক্ষা দান প্রণালী আমরা দেখিতে পাই। সাধারণতঃ প্রশ্ন উত্তর প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশে শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রণালীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনার মাধ্যমে গুরু শিষ্যকে পরাজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ইহাই হেতুবিদ্যায় (Logic) পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীকে কয়েকটি গুণের অধিকারী হইতে হইত। ব্রহ্মচারীর পক্ষে মানসিক প্রশান্তি, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, অন্তর্মুখীনতা অত্যাবশ্যক ছিল। শিক্ষার্থীর উপরেই শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিত।

প্রকৃত গুরুকে বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে হইত। তিনি নিশ্চয়ই ছাত্রের আদর্শস্থানীয় হইবেন—সকলেই আশা করিত। বেদবিষয়ে তাঁহার গভীরতা থাকিবেই। তিনি ত্যাগী, ভোগবাসনা-রহিত, সদাচারী, আদর্শপুরুষ হইবেন। তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় জীবন কাটাইতেন। তাঁহার জ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার ছাত্রের নিকট উজার করিতেন, কিছুই লুকাইয়া রাখিতেন

না। অবশ্য ছাত্রের গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে তিনি বিদ্যাদান করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর ছাত্রই তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। অবশ্য ছাত্রকে গ্রহণ করিবার সময় তিনি তাহার বংশপরিচয় (গোত্র) জিজ্ঞাসা করিতেন। বংশ-পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতেন।

গুরুগৃহে শিক্ষাকালের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তবে ১২ বৎসরের কমে কোন শিক্ষাই সমাপ্ত হইত না। ১২, ১৮, ২৪ ও ৩৬ বৎসর ধরিয়া এক এক শিক্ষার্থীকে বিষয় আয়ত্তিকরণে গুরুগৃহে কাটাইতে হইত। শিক্ষাদানের বিনিময়ে গুরু অর্থ লইতেন না। তিনি বিদ্যাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিতেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রাচীন ভারতে কি লৌকিক জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না? প্রাচীন ভারতে কি বৈষয়িক উন্নতি ঘটে নাই? সকল শিক্ষার্থীই কি পরাজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিত? এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারত যে শিল্পে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে চরম উন্নতি করিয়াছিল ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয়। তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? নিশ্চই এই সকল বিষয়ে উত্তম-রূপে শিক্ষা দেওয়া হইত।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষনীয় বিষয়গুলিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বর্ণাশ্রম প্রথা প্রথম যুগে কঠোর ছিল না। পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে এই প্রথা সুস্পষ্ট-রূপে দেখা দেয়। যাগযজ্ঞ ও পূজার্চ্চনার ক্রিয়া পদ্ধতি ক্রমেই জটিল হইয়া পড়ে। তখন ব্রাহ্মণ শ্রেণী নামে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। প্রথম যুগে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে চারিজন প্রধান পুরোহিতের সাহায্য প্রয়োজন হইত। ইহারা ছিলেন, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তিনজন করিয়া সহকারী লইতেন। যজ্ঞকার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল পরাজ্ঞান লাভ। কালক্রমে যজ্ঞের চারিটি মূল বিষয় জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যও ক্রমে ক্রমে বিশাল হইয়া উঠিল। ইহার ফলে বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন আরম্ভ হয়। আবার যজ্ঞের এক এক বিভাগ হইতে নানারূপ বিদ্যার উদ্ভব হয়। সেগুলিও পঠিতব্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে জ্যামিতি, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, শরীরতত্ত্ব, কাব্য ব্যাকরণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। সমগ্র বেদও একজনের পক্ষে আয়ত্বে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবশ্য বেদের এই পরিবর্দ্ধন এবং অন্যান্য বিদ্যার উদ্ভব অল্প কয়েক বৎসরে ঘটে নাই,—বহু বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার ফলে, বৈদিক ভাষা জনগণের কথ্য ভাষা হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়।

যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যার চর্চ্চা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভাস্কর্য্য, ইতিহাস—পুরাণ, ক্ষত্রিয়বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষনীয় হইল। ক্রমে ক্রমে এইগুলি হইতে অন্যান্য বিদ্যার উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং এইগুলি বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

এদিকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলির যেমন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটিতেছিল তেমনি সমাজ ব্যবস্থাও জটিল হইতেছিল। সমাজের সরলতাও লোপ পাইল। বেদচর্চ্চার আদর্শ ছিল পরাজ্ঞান লাভ। ইহার জন্য শিক্ষার্থী কঠোর জীবন যাপন করিত। যুগপরিবর্ত্তনের ফলে তাহা পরিণত হইল নানাপ্রকার কলাবিদ্যা এবং বৃত্তিমূলক বিদ্যাচর্চ্চায়। আদর্শের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হইল।

অধ্যাত্মসাধনা সকলের জন্য নহে বলিয়া স্বীকৃত হইল। মুষ্টিমেয় মোক্ষকামীদের ইহা বিশেষ সম্পদ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। আর নানা ললিতবিদ্যা ও বৃত্তিমূলক বিদ্যা জনসাধারণের জন্য বলিয়া পরিগণিত হইল। অতএব, শিক্ষাক্ষেত্রেও একটি স্থূল বিভাগ দেখা দিল। পরবর্ত্তীকালে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা আরও দৃঢ়রূপে দেখা দেয়। এইরূপে বিদ্যাসাধনার মূল উদ্দেশ্য হইল জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ নয়,—জাগতিক বৃত্তির চরম বিকাশে। যুগের পরিবর্ত্তনের ফলেই ইহা দেখা দিল। যদিও পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞানদান কার্য্য সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তথাপি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা আদর্শ স্থানীয় ছিল। বহু বৎসর পর আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতার পর নানাবিষয়ে আমরা সংস্কার সাধনে ব্রতী রহিয়াছি। শিক্ষাসংস্কারও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যে সংস্কার আনয়ন করিতে চাহিতেছি তাহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধার করা নীতির দ্বারা সম্ভব হইবে না, বা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক না হতেও পারে। বিদেশী নীতি গ্রহণ করার পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সদ্‌গুণগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং যেগুলি সম্ভবপর সেগুলি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে সুফলেরই আশা করা যায়।

এক—শিউলি—সন্ধ্যা

শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়
৩য় বর্ষ কলা

চলিষ্ণু জনতা।
চকচকে সর্পিল ট্রাম লাইন আর পিচঢালা টানা রাস্তা।
কত টাক আর কালো চুলে ঝকঝকে টেরী
কত লাল, নীল, হলদে, বেগুনি শাড়ী।
চারমিনার আর বিড়ির গন্ধ মিশে একাকার,
মাঝে মাঝে দু একটা
গোল্ডফ্লেক আর ক্যাপষ্টান,
স্নো, সেন্ট আর পাউডারের প্রসাধন
বাতাসকে ক'রে তুলেছে গুরুভার।
মিশে একাকার
ধুতি আর শাড়ী, প্যান্ট আর পাজামা, ভারী আর নরম গলার কথা,
চলিষ্ণু জনতা।
পূজোর পর্ব—
তারই সমারোহ
পথে ঘাটে দোকানে বাজারে।
ঢাকের কাঠিতে ঘা পড়েছে, সুর উঠেছে এ্যামপ্লিফায়ারে
কত গান কত বিচিত্র সুরে!
ঝাঁপা পায় উছলে ওঠে আনন্দের কলতানে,
শিউলি করে বনে বনে।
কয়েকটি নিটোল মুহূর্তের উপভোগ্য অবকাশ
শরতের অনেক কমলালেবু রঙের রোদের মতন
হালকা ক'রে চায়
চিড় খাওয়া, পাল-তোবড়ান মানুষের মনের আকাশ।
তাই আজকের এই প্রদোষের ঘনায়মান অন্ধকারে
যখন সন্ধ্যার ঝিলমিলে কালো স্ক্রীনটা নেমে এসেছে
পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে,

আকাশে তারার চুমকি, মেঘের দোলায়
চাঁদের দোলনা,
ষষ্ঠীর একফালি বাঁকা চাঁদ—সরবতী মিষ্টি জোছনা ;
শরৎ সন্ধ্যার এক জমাট ক্লাসিক রূপ—
মন আজ পেরোতে চায় কাব্যের সীমানা ;
কিন্তু ধাক্কা খায় সামনেই।
রাস্তার খোঁদলে জমা বৃষ্টির জল, লাইট-পোষ্টের আলো আর তারা চারজন
ভেঙে দেয় আমার স্বপ্নিল সন্ধ্যার কল্পনা
মুছে দেয় কাব্যের নিষ্ফল আবেদন।
হঠাৎ দেখলুম তাদের।
এতক্ষণ মশগুল ছিলুম মানুষের মিছিল দেখায়,
চটা ওঠা রাস্তার এমন এক ছন্দোবদ্ধ রূপ কি
সহজে দেখা যায় !
কিন্তু ওকি ! হঠাৎ চমকানিতে সস্তার বিলাস গেল টুটে।
মনে হোল ছন্দটা পয়ার-ত্রিপদীর কোনটাই নয়,—
মিলের অভাব, অমিত্রাক্ষরে
হ'লেও হ'তে পারে।
দেখলুম ওদের—তিনটে বাচ্ছা আর তাদের যুবতী মা
ছেঁড়া আচল বিছিয়ে বসেছে
ফুট পাতের ওপর একটা আলোর তলায়।
বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে
একটা ছেলে ধরেছে চীৎকার
কিন্তু কিছুই নেই দেবার
বুকের দুধও না। তাই একটানা করুণ সুরে চাইছে
কিছু ভিক্ষে।
কেউ বা চলেছে আপন মনে, কেউ বা চাইছে
একবার কটাক্ষে
ওর বেআব্রু শরীরের দিকে।
ভিখিরী হ'লেও যুবতী হাজার হোক।
ছিন্ন শাড়ীতে দেহ ঢাকার নিষ্ফল প্রয়াস,
যৌবনের নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ
বারংবার ; শতছিদ্রে শরীরের অকুণ্ঠ ইসারা।

তাই চায় ওরা।
কিন্তু দিচ্ছেনা কেউই বিশেষ কিছু,
শুধু একঘেয়ে, একটানা করুণ সুর পিছু পিছু
ছুটে যায়।
দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়,
অনেকবার ঘটা ঘটনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।
কিন্তু তবুও কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল।
নতুন জামা কাপড়ের নতুন নতুন গন্ধ অনেকেই ত গায়ে মাখল,
ফোস্কা পড়া পায়ের বিচিত্র খুড়িয়ে চলা
আর ছোট ছোট মুখের প্রচুর কথা বলা
সব মিশে একাকার।
খানিক আগে বৃষ্টি হওয়া পুরোনো-বিবর্ণ-কাগজ-গন্ধ সন্ধ্যার
একটা বিশিষ্ট, অকৃত্রিম রূপ দেবার জন্য
উন্মুখ সকলেই।
কিন্তু সেই মুহূর্তেই
ষষ্ঠীর সন্ধ্যার এই ছন্দিত রূপের মাঝে মর্মে মর্মে অনুভব করলুম
এক আকস্মিক ছন্দপতন।
সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে বেতালা তবলার বোল
রূপসীর পায়ে ষ্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডল।
তিনটে বাচ্ছা আর তাদের যুবতী 'মা,
বদখত গলার সমবেত চীৎকার—একঘেয়ে, একটানা।
রাস্তার পাশে, ফুটপাতের ধার ঘেঁসে দোকানের মেলা
মুঠো মুঠো আলোর আবিরে চলে হোলি খেলা—
মুখর বিপণিতে থরে থরে সাজান পসরার লোভানি।
কিন্তু এও জানি
ওরা তার কামনা করে না।
অচ্ছুৎ সভ্যতার উচ্ছিষ্ট সম্ভোগের
অধিকার-বঞ্চিত
উঞ্ছজীবী উপোসীর খাদ্যের এষণা চলে
ডাষ্টবিনে ডাষ্টবিনে।
কিন্তু হায়, ডাষ্টবিনের সাম্রাজ্যেও
ডেমোক্রাসীর বেয়নেট।

সারমেয় আর মানুষের
মনান্তরের কর্কশ কোলাহলে
মুছে যায় 'লাইকার' অম্লান স্মৃতি
খোকা চাঁদেদের হাতে-গড়া
যত ঐতিহ্যের দ্যুতি।
হাইড্রোজেন বোমায় নিঃশেষিত
ফুটপাথের খাবারের ভাণ্ডার,
সেখানেও মেলেনা খাদ্যের অণু।
তাই কাল সন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
হাইড্রান্টের জল-গেলা নিরন্ন শিশুদের
মর্মন্তুদ হাহাকারে
আর আমার মনের উষর প্রান্তরে
বন্ধ্যা স্বপ্নদের ক্লান্ত সীৎকারে
রচিত হোল পৃথিবীর যত কবিতার
নিষ্করুণ সমাধি।

মাদ্রাজ—ভাষা, শিক্ষা ও সাধারণ পরিচয়।

অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণকুমার সেন
বিদ্যাসাগর কলেজ (সিউড়ি)

মাদ্রাজ মেইলে কোলকাতা থেকে যাত্রা করলাম—নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে' যোগ দিতে। চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিতে গাড়ীর অনেকেই দক্ষিণের দিকে যাচ্ছেন। বড়দিনের মরশুমেই যেমন ফুলকপি মটরশুঁটি তেমনি জায়গায় জায়গায় কন্‌ফারেন্স। কিছু লোক নিছক কন্‌ফারেন্স করতেই যান্। অধিকাংশরাই এক পিঠের ভাড়ায় যাতায়াত হবে ব'লে এই সুযোগে দেশ দেখেন, স্বাস্থ্য ফেরান, ভালমন্দ সওদা করেন।

গাড়ী ছাড়তেই সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠল। আমি যেমন দেহাতী লোক, সঙ্গীরাও তেমনি। তাঁরাও গয়া থেকে আসছেন। আমরা সকলেই দীর্ঘপথের সঙ্গীভাগ্যে সুখী। মাদ্রাজ মেইলে দুদিন দুরাত কাটাতে হবে। শুধু এ্যাণ্ডর ব্যাণ্ডর শুনতে হলেই বিপদ ছিল।

দাক্ষিণাত্য

দক্ষিণ দিকের লাইনের গাড়ীগুলি মন্থর গতিতেই চলে। যেখানে কলকাতা থেকে দিল্লী নয়শ মাইলের চেয়েও বেশী পথ—মেইলে চব্বিশ ঘণ্টায় যাওয়া যায়, সেখানে মাদ্রাজ যেতে ৪১ ঘণ্টা লাগে—পথ মাত্র দুহাজার মাইলের কিছু বেশী।

বাংলা ছাড়িয়ে গাড়ী উড়িষ্যায় প্রবেশ করে এবং সেখানকার বড় শহর, কটক, ভুবনেশ্বর ছাড়িয়ে খুরদা রোড হয়ে বহরমপুর, গঞ্জাম পেরিয়ে গাড়ী বিশাল অন্ধ্রে প্রবেশ করে। অন্ধ্র এখন খুব বড় রাজ্য। গাড়ী প্রায় ২৯ ঘণ্টা এই রাজ্য পরিক্রমায় ব্যয় করে। তারপরেই মাদ্রাজে প্রবেশ করে। একথা মনে রাখা দরকার যে দাক্ষিণাত্য এখন মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতে ভাগ হ'য়ে গেছে। অন্ধ্রের লোকেরা তেলেগুভাষী। মাদ্রাজের মানুষ তামিল বলে, সে দেশ এখন তামিলনাদ। অন্ধ্র আর তামিলনাদ উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে। এই দুই দেশের পশ্চিমে আছে ক্যানারিজ ভাষা-ভাষী মহীশূর অঞ্চল আর মলয়ালাম ভাষাভাষী কেরল অঞ্চল। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ওয়ালটেয়ার পর্যান্ত নেমে এসেছে—তারপরেই দক্ষিণ রেলপথ যা' দক্ষিণে রামেশ্বরম ধণুকোটি পর্য্যন্ত লম্বিত।

ইংরাজী বনাম হিন্দী

আজকাল ইংরেজী বনাম হিন্দী নিয়ে দেশে খুব তোলপার হ'চ্ছে। দক্ষিণদেশের বিশেষ ক'রে মাদ্রাজের লোকেরা হিন্দীর ঘোর বিপক্ষে। সেদিনও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী সুব্রাহ্মনীয়ম্ ভাষাসংক্রান্ত প্রস্তাবের বক্তৃতায় দক্ষিণ দেশের ইংরাজী প্রীতির কথা বললেন। রাজাজী তো ভাষার ব্যাপারে এতদূর জড়িয়ে পড়েছেন যে প্রয়োজন হ'লে তিনি ইংরাজীর ওকালতনামা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দল নেহেরুজীর বিরুদ্ধে বিমান ঘাঁটিতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তাকে নিন্দা করেও রাজাজী কিছু বললেন না।

দাক্ষিণাত্যের সাধারণ লোক ও ইংরাজী

মাদ্রাজ যাত্রার পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে দক্ষিণ দেশের লোকেদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা ইংরেজী। ১৯৫৭ সালে আমি ভিজাগাপট্টম, ওয়ালটেয়ার

প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে সাধারণ লোক, বিশেষ ক'রে দোকানদার, বাস কণ্ডাকটরেরা কিছু ইংরাজী বোঝে। কিন্তু এবারকার মাদ্রাজ পরিক্রমায় আমার সেই ধারণা আমূল পরিবর্তিত হোল। মাদ্রাজে তার অনেক আগে থেকেই সাধারণ লোক ইংরাজী বোঝে না। হিন্দী তো মোটেই না। এর ফলে উত্তরের লোকেদের সেখানে কি পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয় তা অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে আমার জাপান সফরের কথা মনে পড়লো। সেখানে সকালে প্রাতরাশের পর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে দোভাষী থাকতেন। কিন্তু তার পূর্ব সময়ের জন্য এবং দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য কিছুটা জাপানী শিখেছিলাম। সদ্য শেখার জন্য শব্দগুলি গোলমাল হ'য়ে যেত। আমার গলায় ব্যথা হওয়ার জন্য সকাল বেলায় নুন জলের কুলকুচি করব। পরিচারিকাকে বললাম "আতসাই মিজো" অর্থাৎ গরমজলের সঙ্গে "সিকো" আনো। "সিকো হোল চিনি আর "সাটো" হোল নূন। এখন 'সিকো' আর 'সাটো' দুটো আমার গোলমাল হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে পরিচারিকা প্রত্যেকবারই গরম-জলে চিনি মিশিয়ে আনে। নানা রকমে মাথা নেড়ে, হাত নেড়েও বোঝাতে পারলাম না। চতুর্থবার গোলমাল হবার পর স্যুটকেশ খুলে জাপানী বই বের করলাম। তারপর সমস্যার সমাধান হোল। সাধারণতঃ যেখানে ভাষা জানা থাকে না সেখানে ইসারায় কথা চলে; হাতের এবং অঙ্গভঙ্গির— আন্তর্জাতিক ভাষা চলে। মাদ্রাজে তাও অচল। কারণ তাঁদের ইসারাগুলির অর্থ আমাদের ইসারার অর্থ থেকে ভিন্ন। আমরা গররাজী হ'লে মাথা নাড়ি; কিন্তু সেখানে 'হাঁ' বলতে হলে ঘাড়টি পেণ্ডুলামের মত ডাইনে-বাঁয়ে দোলাতে হ'বে। এবং এই দোলান অতি দ্রুত হ'লে তার অর্থ অন্যরকম দাঁড়াবে। এর ফলে আমার পরিচিত এক বিলিতি কোম্পানীর জনৈক টেকনিকাল্ রিপ্রেজেন্টেটিভ মাদ্রাজে একটি মহিলার সম্পর্কে ভয়ানক গোলমালে পড়েছিলেন—যে হোটেলে তিনি ছিলেন তাঁর ম্যানেজারের উপস্থিত বুদ্ধিতে পুলিশ-কেস্ থেকে তিনি অব্যাহতি পান।

আমাদের বড় রকমের কোন গোলমাল হয়নি তবে ছোটোখাটো অসুবিধা হয়েছে। যথা, খাবার চেয়ে খাবার পেলাম না, ট্যাক্সিকে এক জায়গায় যেতে বললুম—অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। ভাষা না জানায় যে সব সময় অসুবিধা হয়েছে তা নয়। দু'একটা ছোটোখাটো লাভও হয়েছে। একটা ঘটণা বলি, মাদ্রাজ থেকে ১২৫ মাইল দূরে দক্ষিণে হোল পণ্ডিচেরী। বাসে যেতে হয়—থ্রু বাসও আছে আবার বদল ক'রেও যাওয়া যায়। থ্রু বাস না পাওয়ায় পথে একজায়গায় আমাকে বদল করে যেতে হবে। যে বাস মাঝপথে এলো তাতে পেছনের দিকে দু'একটি 'সীট্' ছাড়া সবই ভর্তী। ওদিকের নিয়ম হোল বাসে ওঠবার আগেই টিকিট করতে হবে। আমি টিকিট করতে চাই। ওরা ঘাড় নাড়ে এবং বলে টিকিট নেই। এখন কোন রকমে বলি যে "স্কোয়াট্টা ফ্লোরা"—অর্থাৎ মেঝেতে বসব। ওদিকে, বিশেষ ক'রে তেলেগু ভাষায় অনেক কথাই ইংরাজী থেকে 'অকারান্ত' করলে একটা কোন অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু আমার কথা এরা বোধহয় বুঝল না। একটা আঙ্গুল দেখাল আমি বুঝলাম একটাকা উৎকোচ লাগবে। যথা-রীতি মাথা নাড়লাম। বাসে চড়াল। ভাড়া দিলাম। তারপর আরো একটাকা দিলাম। লোকটি ১৬ আনা ভাঙ্গানী দিল এবং আবার একটি আঙ্গুল দেখাল। আমিও বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লাম।

সেও নাড়ল। সে কি বলতে চেয়েছিল আজও বুঝলাম না। কিন্তু টাকাটা আমার পকেটে ফিরে এল।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ পৌঁছুলাম। শিক্ষা সম্মেলনের স্বেচ্ছা-সেবক ছিল। কিন্তু সে ইংরাজী বললেও সে ইংরাজী আমার বোধগম্য হোল না। গল্প শুনেছিলাম যে এক মদ্রতনয় লণ্ডনে ব্রেকফাষ্টে টাকা বাঁচানোর জন্য সকালে দুটো ডিমসেদ্ধ নিয়ে হোটেলে গেলেন, বয় তাঁকে টোষ্ট এবং চা দিল। কিন্তু বিলে ডিমের দাম ধরলো। তখন মদ্রসন্তান হাত পা নেড়ে বোঝাতে লাগল, "ইয়োর টোষ্ট বাট্ মাই এগ।" সেই বিচিত্র ইংরাজী হোটেলের ম্যানেজার বুঝলেন না। তখন এই নাটকের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে বললেন।

মাদ্রাজ বড় সহর। কিন্তু লোক সংখ্যা মাত্র ১৪ লক্ষ। কাজেই কোলকাতার মত ঘিঞ্জি নয়। রাস্তাঘাট যথেষ্ট ফাঁকা। ট্যাক্সি সস্তা, মাইল প্রতি ছয় আনা। অটো রিক্সা মাইল প্রতি চার আনা। হাতে টানা রিক্সা এবং সাইকেল রিক্সাও আছে। বাস চলে, ট্রাম আগে চলত; এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মাদ্রাজ সহর ঐ নামের একটি গ্রাম কিংবা 'মাদ্রাসা' এই কথা থেকে উদ্ভূত।

সহরে কোর্ট, সেনেট হাউস, গান্ধী মিউজিয়াম দেখবার মত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল 'মেরিনা' অর্থাৎ মাদ্রাজের 'সী-বিচ'। সী-বিচে ভারী চমৎকার ফুলের বাহার। প্রসঙ্গত মাদ্রাজ-বাসীর পুষ্পপ্রীতি উল্লেখযোগ্য। রাস্তায়-ঘাটে এমন কি ষ্টেশনেও ফুল বিক্রি হয়। মেয়েরা ফুলের গয়না পরে। ফুলের বাগানে বাঁধানো বসবার জায়গা। মার্কারি আলোর বাহার ছাড়াও সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য একটি সুইমিং পুল এবং একটি ভালো রেঁস্তোরা মেরিনার শোভাবর্দ্ধন করছে।

মাদ্রাজ এবং আশেপাশের অঞ্চলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের আবহাওয়া আমাদের দেশের ফাল্গুন মাসের মত। সুন্দর হাওয়া, গাছে গাছে ফুলের শোভা, পাখীর গান। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন যে মাদ্রাজ খুব ঠাণ্ডা নয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা। তাই গরম কাপড় চোপর লেপ রাগ নিয়ে গিয়েছিলাম, এগুলো কোন কাজে লাগল না। তখন খাঁটি মাদ্রাজী সাজলাম। ৪ হাত ধুতি এবং সার্ট কিনলাম। শুধু কি বেশ ভূষায়, খাবারেও স্থান মাহাত্ম্যে মাদ্রাজী হলাম। সকাল বেলায় চা পাওয়ার উপায় নেই। সর্ব্বত্রই কাফি। এদিকে যেমন চা চা সবাই চা-তক ওদিকে কাফিই পর্য্যাপ্ত বা কাফি মিলতা হ্যায়! কাফির সঙ্গে খাবার প্রধানতঃ তিনটি। একটি ইড্‌লী। খুব সস্তা চালের গুঁড়োর সেঁকা পিঠে—সঙ্গে ডাল, তরকারী পাওয়া যায়। আর একটি দোসে—দোসে দুরকম। এক সাধারণ দোসে—দাম দু আনা; দ্বিতীয়টি মসলে দোসে অর্থাৎ চালের গুঁড়োর বড় পিষ্টক এবং তার মধ্যে তরকারীর পুর। ইড্‌লী এবং দোসে ছাড়া আর একটি খাদ্য আছে—সেটি ভাদাই অর্থাৎ কলায়ের ডালের বড়া। কলা এবং কাজু বাদাম যথেষ্ট ও সস্তা। পানও খিলির আকারে থাকে। ওরা বিড়া বলে। প্রচুর বিক্রী হয়।

দুপুর এবং রাত্রির খাবার প্রায় একরকমই। খুব মিহি চাল মাদ্রাজীরা খায়। তার দামও সস্তা। দশ আনায় এক ডিস অর্থাৎ ৩½ পাউণ্ড পাওয়া যায়। এই ভাতের সঙ্গে ওদের তিনটি প্রধান উপাদান হোল যথাক্রমে, সম্ভরম, রসম্ ও অপল্লম্। সম্ভরম্ হোল মশলা দেওয়া ডাল। রসম্ হোল পেঁয়াজ রসুনের সম্ভার দেওয়া তেঁতুলের ঝোল

অপল্লম্ হোল কাঁচা লঙ্কার কুঁচি দেওয়া ঘোল। এ ছাড়া কিছু চাটনি বা একটু তরকারিও পাওয়া যায়। দাম খুব সস্তা, আট আনায় ভরপেট খাওয়া যায়। মাদ্রাজে দুরকমের হোটেল আছে—সিভিল আর মিলিটারী। সিভিল হোটেলে নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যায়, মিলিটারি হোটেলে আমিষ। শতকরা ৮০টি হোটেলই সিভিল। সিভিল হোটেলের কতকগুলির গায়ে লেখা—ব্রাহ্মণ হোটেল। এই ব্রাহ্মণ হোটেলগুলির বিরুদ্ধেই দ্রাভিদ কাজাঘাম সত্যাগ্রহ করেছিল। আমরা যেখানে খেতাম, সেই মুরলি কাফেতেও সত্যাগ্রহ চলছিল। আমরা ব'লে নিরস্ত করেছিলাম। কতকগুলি হোটেলের গায়ে লেখা উদিপি ; উদিপি হ'ল রান্নার উৎকর্ষের চিহ্ন। উদিপি বলে মালবারে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার লোকেরা ভাল রাঁধে। মাদ্রাজের হোটেলগুলির মালিক প্রায়ই উদিপির লোক। উদিপি লেখা থাকলে বুঝতে হবে উদিপির লোক এখানে আছে এবং রান্না ভাল হয়।

মাদ্রাজের সওদা

কেনাকাটার মধ্যে মাদ্রাজের ক্রেপশাড়ী খুব ভাল এবং সস্তা। তাছাড়া ব্যাঙ্গালোর বিনির কাপড় চোপড় এখানে পাওয়া যায়। ষ্টীলের বাসন এদিকের লোকে ব্যবহার করে এবং কোলকাতার তুলনায় দাম কম। বেতের জিনিষ এবং কাঠের জিনিষও খুব সস্তা। জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম যে মাদ্রাজে তিনটি প্রধান ব্যবসা আছে—একটি সিনেমা, দুই ট্রান্সপোর্ট, তিন হোটেল। জেমিনি এ, ভি, এম, প্রভৃতি ষ্টুডিও মাদ্রাজেই। মাদ্রাজের রাস্তা ভাল এবং সেখানে রেলের চেয়ে বাসেই বেশী লোক যাতায়াত করে। হাজার হাজার বাস সেখানে। হোটেলের ব্যবসাও খুব ভাল। সাধারণতঃ লোকেরা বাড়ীতে রান্না করেন না। হোটেলেই খান। তাই প্রত্যেকটি হোটেলেই খরিদ্দারের ভিড় লেগেই থাকে।

মাদ্রাজের উচ্চশিক্ষা

আমাদের পক্ষে মাদ্রাজের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আলোচনা করার মত। সেখানে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংরাজীতে চার পেপার—এইভাবে অনেকগুলি বিষয়ের কোর্স নতুন করে তৈরী হয়েছে। মাদ্রাজের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁরা বললেন যে মাদ্রাজে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন হওয়ার জন্য কলেজে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, একথা সত্য নয়। প্রত্যেক কলেজেই কিছু কিছু ছাত্র কমেছে তবে তার কারণ হচ্ছে অন্য ; সব ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিই ডিগ্রী কলেজ হয়ে যাওয়াতে ছাত্ররা ছড়িয়ে গেছে। মাদ্রাজের কলেজগুলির মান সাধারণ ভাবে উঁচু। সেখানে বহু যোগ্য পাশ করা লোক আছেন। পশ্চিম বাংলা বা আসামের মত অধ্যাপক-দুর্ভিক্ষে সেখানকার উচ্চশিক্ষা পীড়িত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকেছে কিন্তু তার প্রভাবে এফিলিয়েশন সস্তা হয়ে যায় নি! U.G.C.র চেয়ারম্যানের মতে বর্ত্তমান মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সর্ব্বোচ্চ। কাজেই আমরা দিল্লীর মেনেনজাইটিস্ হয়েছে ব'লে যত পরিহাসই করি না কেন, মেনন বা আয়ারদের সাফল্যের মূলে তাঁদের দেশের সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাই রয়েছে।

কলেজ-প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়
[প্রাক্তন ছাত্র]
ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, দার্জিলিং সরকারী কলেজ

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ষাট বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী স্মারক-সংখ্যা বের হচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা। গৌরবের কথা। আমাকে কিছু লিখতে হবে। তাই একটু বিব্রত বোধ করছি।

আজ কলেজের নানা কথা মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দু বছরের স্মৃতি। কালের নিরিখে কতটুকু ? তবু সেই স্মৃতি অফুরন্ত। অমূল্য।

অবাক হই যখন ভাবি—জেলা সহরে নয়, মহকুমা সহরে নয়, অনগ্রসর বীরভূমের নামহীন এক পল্লীতে ষাট বছর আগে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ষাট বছর আগের কথা। অতি সাধারণ পল্লী। অশিক্ষায় কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন এক গ্রাম। দারিদ্র-লাঞ্ছিত গ্রাম। তবু ঐশ্বর্য্য ছিল। রাজার ঐশ্বর্য্য। একটি পরিবারে ঐশ্বর্য্যে সমগ্র অঞ্চলটি ঐশ্বর্য্যবান হলো। চতুষ্পাঠী হলো। স্কুল হলো। কলেজ হলো। রাজগৃহ এই কলেজের সূতিকাগৃহ। নবজাত শিশু রাজ-সমারোহে বেড়ে উঠলো। রাজ-পরিবারে আর পাঁচটা বিলাসের মধ্যে কলেজও একটা বিলাস। মহৎ বিলাস। কীর্ত্তির ইমারৎ বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। রাজবাড়ীর প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে শুধু বীরভূম নয়, বাংলাদেশ ও বিহারের বহু দরিদ্রসাধারণ ছাত্র স্বল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পেলো। বাংলাদেশের কলেজের সংখ্যা তখন হাতের আঙুলেই গোণা যেতো। সেদিন বীরভূমে এক অচেতন পল্লীতে কলেজের স্বপ্ন, স্বপ্ন-বিলাস বৈ কি ? সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ হেতমপুর রাজবাড়ীর এক মহৎ কীর্ত্তি। অনন্য কীর্ত্তি।

আমরা যখন স্কুলের গণ্ডী পার হলাম তখন অনেক কলেজ চারিদিকে। অনেক খ্যাতি তাদের। শান্তিনিকেতন তখন আন্তর্জ্জাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রে ভাস্বর। হেতমপুর তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে অনেকটা কোণঠাসা। তবু বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্র শান্তিনিকেতনকে বাদ দিলে হেতমপুরই ছিল বীরভূমের একমাত্র কলেজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে বেধেছে। বোমাতঙ্ক তখন সিউড়িতে বিদ্যাসাগর কলেজতরুর পুষ্পিত শাখা রোপণ করেন। যুদ্ধের যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির মত এখন কলেজস্ফীতি হয়েছে অনেক। বীরভূমেও। তখন কিন্তু বীরভূমে হেতমপুর ছিল এক ও অদ্বিতীয়। সেদিনের কথা। ১৯৪০ সাল। সিউড়ী জিলাস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হেতমপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। বিরাট কোন আশা নিয়ে কলেজে আসিনি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। সাধারণ ভাবেই লেখাপড়া করেছি। তাস খেলেছি। আড্ডা মেরেছি। সঞ্চয়ের চেয়ে অপচয় করেছি অনেক। কিন্তু আফশোষ করিনি। অতি সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন। শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। মানসায়র হোষ্টেলে থাকি। হোষ্টেল থেকে কলেজ। এক মাইল পথ। শালবনের ভিতর দিয়ে। রাঙামাটির পথ দিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলা। একাও গেছি অনেকবার। এ পথে কতবার গেছি। কলেজ

থেকে ফিরে বটবৃক্ষের বাঁধানো গোল-বেদীর চারিধারে গোল হয়ে বসেছি। তার স্নেহ-ছায়া উপভোগ করেছি। সেখানে বসে টিফিন খেয়েছি আর গল্প করেছি। অবিশ্যি গল্প করার মত ছিল না কিছুই। ছাত্রজীবনে কোনদিনই একলব্য-নিষ্ঠা ছিল না। বিস্ময়কর শ্রুতি বা স্মৃতি ছিল না। অণুবীক্ষণী দৃষ্টিও ছিল না। অধ্যাপকদের মধ্যেও সরবে ঘোষণা করার মত কিছু ছিল বলে মনে হয়নি কোনদিন। তবু যা পেয়েছি তাঁদের কাছে, তার তুলনা মেলে না। তাঁদের সারল্য, আন্তরিকতা ও সহজ ভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করতো। আর্থিক দৈন্য হয়ত তাঁদের ছিল, কিন্তু মনের দৈন্য দেখিনি কোন দিন। ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক তিক্ত হয়নি কোনদিন। অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরী ছিলেন আমাদের হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। প্রতিদিন বিকেলবেলায় তিনি হোস্টেল দেখতে আসতেন। সঙ্গে অন্যান্য অধ্যাপকও আসতেন। তাঁরা তামাক খেতেন আর খবরের কাগজ উল্টাতেন। কত কথা বলতেন আমাদের সঙ্গে। গ্রামের কথা। দেশের কথা। বিদেশের কথা। সেদিন ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল। খবরের কাগজে দেখলাম: সুভাষচন্দ্র বসু গত পরশু থেকে নিরুদ্দেশ। কয়েকদিন ধরে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। রুদ্ধদ্বারকক্ষে জপতপ করছিলেন। হঠাৎ নিরুদ্দেশ। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি কোন সন্ধান পেলো না। আমাদের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবন-তটে বিরাট বিস্ময়ের একটা ঢেউ আছড়ে পড়লো। চাঞ্চল্য জাগলো। কয়েকদিন ধরে কী আবেগ। কত উদ্বেগ, কত আশা। কত স্বপ্ন অবিসংবাদী নেতাকে কেন্দ্র করে। আর একটি দিন। ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১ সাল। বিকেলবেলা খবর পেলাম: কবিগুরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বনস্পতি মৃত্যু? পরদিন স্মরণ-সভা হলো কলেজে। "চৈত্রের শালবনের" কথা মনে হলো শ্রাবণের শালবনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে।

হোস্টেলের পাশেই শালবন। আশ্চর্য্য মায়া এই শালবনের। আমার সকালের সঙ্গী। দুপুরের পথের সাথী। বিকালের বন্ধু। বেশ মনে আছে। সরস্বতী পূজার আগের দিন। হোস্টেলে মহোৎসবের প্রস্তুতি চলছে। সাজসজ্জার ঘটাও খুব। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সরল শাল শিশু কাটতে হবে। তোরণ তৈরী হবে। চুরির পাট নিতে হবে। ভয়ে বুক দুরু দুরু। তারপরেই ভয় কোথায় ডুবে গেল আনন্দের জোয়ারে। সরস্বতী পূজা শুধু কলেজে নয়, গ্রামেরও প্রধান উৎসব। রাজার ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী। বিরাট মেলা। কলকাতার থিয়েটার। বড় বড় শিল্পীর সমাবেশ। নাচগান জলসা যাত্রা নানা উৎসব। একঘেয়ে জীবন উৎসবের বৈচিত্র্যে নেচে ওঠে। গ্রামবাসীদের মরা প্রাণেও উচ্ছাসের বন্যা নামে।

আবার গতানুগতিকতা। খাওয়ার পরে পড়া। পড়ার পরে খাওয়া আর শোয়া। কখনো বা মন উড়ে চলে গল্পের রাজ্যে। মেঘের দেশে। অধ্যাপক শরৎ সেনের কথা মনে পড়ে। দুর্ভাগ্য, তিনি বেঁচে নেই। তাঁর কাছে শেলীর 'স্কাইলার্ক' পড়তে পড়তে মন উড়ে চলতো অনন্ত আকাশের দিকে। অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরীর কাছে 'প্যারাডাইজ লষ্ট' পড়তে পড়তে নেমে আসতাম নরকে। কিন্তু নরকের গ্লানি ছিল না মনে। 'Satan' এর মতই স্বর্গ রচনা করতাম। নরকে। তার প্রতি সহানুভূতি, মন আমার ভরে উঠতো। তার অদম্য সাহস ও প্রাণশক্তির অজস্রতা আজও প্রাণে সারা লাগায়। শাস্ত্রী-মশায়ের "celestial cow" সুরভি আমার মনকে সুরভিত করে রেখেছে। কামধেনুটিকে আজও আমি ভুলিনি।

তারপর পনর বছর পার হয়ে গেছে। আমার পূজনীয় অধ্যাপকদের মধ্যে প্রায় সকলেই অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদেরই উত্তরীয় আমি ধারণ করেছি। তাই হেতমপুর কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। লক্ষ্য করেছি: কলেজের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে। আসবেই। ব্যক্তির জীবনে ষাট বছর বার্দ্ধক্যের শৈথিল্য আনে। প্রতিষ্ঠানের জীবনে দেখতে পাই—বার্দ্ধক্য নয়, যৌবনের পরিপুষ্টি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। হেতমপুর কলেজের দুর্দ্দিন এসেছিল। ঝড় ঝঞ্ঝায় জ্ঞানপ্রদীপের শিখাটি কেঁপে উঠেছিল। প্রতিযোগিতায় সাময়িকভাবে হটতেও হয়েছিল। কিন্তু এই পিছিয়ে যাওয়া এগিয়ে চলারই প্রস্তুতি-পর্ব্ব। কলেজটি আজ সরকারী সাহায্যে আমার অগ্রজ-প্রতিম অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও সুধী অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কামনা করবো: শিক্ষায়তনটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। সংযোগ রাখবো কলেজের নবাগত ছাত্রদলের বলিষ্ঠ চিন্তার সঞ্জীবনী ধারার সঙ্গে।

মহাকবি ভাস

শ্রীসাধনচন্দ্র সাঁপুই বি. এ
[প্রাক্তন ছাত্র]

বঙ্গভাষা-জননী সংস্কৃত ভাষা। ভারতবর্ষের আদি ভাষা সংস্কৃত। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব হইতে এই ভাষা ছিল ভারতের প্রায় সর্ব্বদেশীয় লেখ্য ভাষা। আর কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। ভারতীয় জীবনের সমস্ত কিছুর পরিচয় এই প্রাচীন ভাষায় লিখিত সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত আছে। এই সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তৎকালীন সুধী সমাজ স্ব স্ব বিদ্যাবত্তার প্রকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রথম যুগের সংস্কৃত ছিল গাম্ভীর্য্যময়—শব্দাড়ম্বর যুক্ত। অল্পবুদ্ধি রস-পিপাসু পাঠকের প্রবেশাধিকার ছিল না কাব্যের নিষিদ্ধ ভূমিতে। মহাকাব্য ও নাটকের ললিত লাবণ্যময় বর্ণনার মধ্য হইতে রস আহরণ করিবার প্রয়াস ছিল শৃগালের আঙ্গুর ফল আস্বাদন করার বাসনার মত। এমনি একটি যুগে লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন কবি ভাস। তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নৈসর্গিকী শোভায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বভাবকবি নাট্যকার ভাস অকৃত্রিম কাব্যপ্রতিভার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভাস সুধীসমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া চির সম্রাটরূপে বসিয়া আছেন। যুগে যুগে কত কবি, কত ক্রান্তদর্শী মনীষী তাঁহার স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনী প্রসূত নাটকাবলী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য অবদান। সর্ব্বযুগের কবিসম্রাট, কবিকুল চূড়ামণি ভারতীর বরপুত্র কালিদাস তাঁহার স্তুতি-গান করিয়া বলিয়াছেন—প্রাচীন কবি ভাস—'সৌমিল কবিপুত্র'। এই কবি তাঁহার নমস্য।

দুঃখের বিষয় কবি ভাসের কাব্যপ্রতিভার মূর্ত্ত-প্রকাশ তাঁহার ত্রয়োদশ নাটক পরশ্রীকাতর হীনমনা রাজা ও কবি শূদ্রকের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অপপ্রয়োগ হেতু অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চারুদত্ত নাটকটিকে মৃচ্ছকটিক নাম দিয়া পুনর্মুদ্রণ সম্পাদন করিয়াছিলেন রাজা শূদ্রক। কবি ভাসের তেরটি নাটকই তাহার ঈর্ষানলে ভস্মীভূত হইয়া কিছুদিনের জন্য ভাসের কাব্যপ্রতিভার প্রকাশকে বাধাহত করিয়াছিল। অতঃপর ১৯১০ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় ত্রিবাঙ্কুর হইতে তালপাত্রে লিখিত ভাসের নাটকগুলির উদ্ধার করিয়া নষ্টকীর্ত্তি ভাস প্রতিভাকে পুনরুদ্ধার করিয়া অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাহার পর হইতেই ভাসের নাট্যপ্রতিভা সর্ব্বজন বোধগম্য হইয়াছে।

মহাকবি ভাস ছিলেন সর্ব্বযুগের বন্দনযোগ্য মহাকবি। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর পথিকৃৎ। তথাপি এই মহাকবিকে সহ্য করিতে হইয়াছে সমালোচনার বিদ্রূপবাণ। ঈর্ষান্বিত ছিদ্রান্বেষী সমালোচককুল শাস্ত্রদাতে অস্থির হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিয়াছেন নির্ম্মমভাবে। কুচক্রী বিদ্বেষীরা তাঁহাকে করিয়াছেন দগ্ধ। রাজ-শেখর ভাসের অগ্নিপরীক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—শঠেরা ভাসের নাটকচক্র পরীক্ষার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে স্বপ্নবাসবদত্তা দগ্ধ হইল না,

সগৌরবে বিরাজ করিতে লাগিল। টীকাকার জোনরাজ বলিয়াছেন—খলদের মুখের আগুনে ব্যাস ও ভাস উভয়েই কষ্ট পাইয়াছেন কিন্তু আনন্দের বিষয় ব্যাস ও ভাস উভয়েই কল্পান্তস্থায়ী কৃতিত্বের অধিকারী। ভাসের সশরীরে বর্ত্তমান সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকগণ অনেকেই সন্দিহান। ভাসের নামে প্রচলিত ত্রয়োদশ গ্রন্থ সকলি ভাসের কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যুগে যুগে ভাসের সরল ভাষা, ভাসনৈক্য পদ্ধতির ঐক্য অবলম্বনে কি প্রকারের অত্যাচার যে তাহার উপর চলিতেছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কালীপদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রকাশিত যজ্ঞফল নামক গ্রন্থ হইতে। ভাসের নামে প্রচলিত এই যজ্ঞফল গ্রন্থটি ভাসের নামে জালিয়াতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ভাসের নাট্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে রেখাপাত করিতে গিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে মহাকবি বাণ বলিয়াছেন—

"সূত্রধার কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ
সপতাকৈর্যশোলেভে ভাসোদেব কুলৈরেব।"

অর্থাৎ ভাসের নাটক সূত্রধার দ্বারা আরম্ভ, তাঁর নাটকে পাত্রপাত্রী সবই আছে; পতাকা নায়কও অনেক; নাটক সমূহদ্বারা দেবকুলদ্বারাও তিনি যশলাভ করিয়াছিলেন। নাটকের আরম্ভ হইত নান্দা নামক আশীর্ব্বচনের মধ্য দিয়া। নাটকীয় বস্তুর আলোচ্য বিষয় নান্দী ও প্রস্তাবনার দ্বারা সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে ঐতিহ্যময় পটভূমিকার সৃষ্টি করিত।

তাঁহার নাটকীয় চরিত্রাবলীর সংখ্যা গরিষ্ঠতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্বপ্নবাসবদত্তায় ১৬টি নাটকীয় চরিত্র, যৌগন্ধারয়নেও ১৬টি, অবিমারক, অভিষেক ও পঞ্চরাত্র এর মধ্যে প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩০টি, বালচরিতে ১২টি এবং চারুদত্তায় ৩০টি চরিত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিরাট বাহিনীর সমাকৃতি অন্যান্য নাটকের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আবার চরিত্র সংক্ষেপ করার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। অবিমারকে কাশীরাজ বা সুচেতনার মঞ্চে আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত হইলেও তিনি তাহাদিগকে মঞ্চান্তরালে রাখিয়া নাট্যের সুষ্ঠুসাবলীল গতি প্রকাশ দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাক্ সংযম প্রচেষ্টাও অনুকরণীয়। নাটকীয় চরিত্রের মঞ্চে আবির্ভাব দ্বারাই তার প্রয়োজনীয়তা দ্যোতিত হইয়াছে। বাগাড়ম্বর অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাষণ তাঁহার নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। এক কথায় নাট্য প্রতিভার সুষ্ঠু বাণীবদ্ধ বিন্যাস তাঁহার নাটকাবলীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভাসের নাট্যগ্রন্থ একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। প্রাচীন মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাসের বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে তিনি ভাষার যে বর্ণাঢ্য আলিম্পন দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবে অম্লান বরমাল্য দান করিয়াছে। তাঁহার রচিত নাটকাবলীর সংখ্যা সম্বন্ধে যদিও অদ্যাপি সমালোচক সম্প্রদায় একমত প্রকাশ করেন নাই তথাপি তিনি যে ত্রয়োদশ নাটকাবলীর জনক তাহাতে সন্দেহ করা ঈর্ষায় গাত্রদাহ অনুভব করা ভিন্ন আর কিছু নয়। রামায়ণ অবলম্বনে তিনি রচনা করিয়াছেন (১) প্রতিমা, (২) অভিষেক। মহাভারত অবলম্বনে (১) মধ্যমব্যায়োগ (২) দূত ঘটোৎকচ (৩) কর্ণভার (৪) দূতবাক্য (৫) উরুভঙ্গ (৬) বালচরিত ও (৭) পঞ্চরাত্র। প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল (১) অবিমারক (২) চারুদত্ত (৩) প্রতিজ্ঞাযোগন্ধারয়ণ ও (৪)

স্বপ্নবাসবদত্তা। এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াও তাঁহার অক্লান্ত লেখনী কোথাও "জড়তা প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বত্রই তিনি রচনাশৈলীর চারু আলিম্পন দ্বারা স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় কোথাও জড়তা নাই, ভাবের দৈন্য নাই, নব নব চিন্তোন্মেষের বিরতি নাই, ভগীরথ খাতাবচ্ছিন্ন অঙ্গধারার মতই পাঠকমণ্ডলীর হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত ক'রে পতিত পাবনী তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সাগর-সঙ্গমে অসীমের সন্ধানে।" প্রত্যেকটি নাটকেই ভাষার সাবলীলতা ও অনবদ্যতা বর্ত্তমান। তাঁহার ভাব-গতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—উহা "আপন গতিতে আপনি অগ্রসর —রাখে না অপেক্ষা কারো।" শুধু রামায়ণ মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্রহণ করিয়া নাট্য-রচনা করিয়া—রামায়ণী মনোভাবই তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মহাকাব্যের রসরূপের সহিত "আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া" তিনি নিত্য নূতন ভাবের রূপকে ভাষায়িত করিয়াছেন। প্রয়োজনবশে নূতন বস্তুরসংযোজন এবং পুরাতন বস্তুর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তিনি স্বীয় মৌলিকত্বের প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মধ্যমব্যায়োগের মধ্যে মধ্যম পুত্রের আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমস্ত নাটককে সুমধুর করিয়া স্বামীর প্রতি হিড়িম্বার প্রেমেও পুত্রের মায়ের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে নবীন রসের সঞ্চার হইয়াছে। বালভারতে কবির প্রতিভা অন্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দর্শকমণ্ডলীর নিকট তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন বর্ণ বৈচিত্র্য। তাঁহার কাব্যে বীর রসের সঙ্গে শৃঙ্গার ও অদ্ভুত রসের অদ্ভুত সংমিশ্রন ঘটিয়াছে। তাঁহার কাব্যে দ্রুতগতিত্ব ও তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই গুণেরই অভাব। কবি আপন প্রতিভাবলে নিজ নাটকের মধ্যে বিশেষ করিয়া অবিমারকের মধ্যে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নির্ঝর তাঁহার কাব্যের রস সরোবর হইতে নির্বাধ গতিতে ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রেমিক প্রেমিকার শুভমিলন তাঁহার কাব্যের দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ নির্ঝর স্বরূপ। কিন্তু মানবপ্রেমের পূর্ণ প্রকাশ হইতেছে তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্তা। এই গ্রন্থের নায়িকা বাসবদত্তা সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত চিরশ্রদ্ধেয়া চিরবন্দনীয়া। পদ্মাবতী রূপ গুণে অতুলনীয়া, স্বামীর হিতসাধন মানসে আত্মবিহ্বলা। নায়ক উদয়ন বাসবদত্তা প্রেমমুগ্ধ উদার প্রেমিক। জাগতিক কারণ সঞ্জাত প্রেমে স্বর্গীয় সুষমা বিরাজিত থাকে না। তাই পদ্মাবতী লৌকিক ধর্ম্মপত্নী হইয়াও উদয়নের অন্তর-রাজ্যের অতন্দ্র অভিসারিকা নহেন। অন্তর-রাজ্যের একছত্র সম্রাজ্ঞী শিষ্যা বাসবদত্তা। তিনি অন্তরের অতন্দ্র প্রহরিণী; চিত্তোন্মাদনকারিণী তাঁর স্বপ্নস্মৃতি। পদ্মাবতীর রূপ, স্বভাব-মাধুর্য্য সত্যই বহুমানযোগ্য। কিন্তু উদয়নের প্রাণ সতত পড়িয়া আছে সেই "মুগ্ধ-চোখের প্রথম আলো, সকল ভালোর প্রথম ভালো" বাসবদত্তার কাছে ঃ—

"পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীল মাধুর্য্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং নতু তাবন্মে মনো হরতি।"

বাস্তবিকপক্ষে—বাসবদত্তা, পদ্মাবতী উদয়নের চরিত্র চিত্রাঙ্কনে ভাস অপূর্ব্ব লোকান্তর্দৃষ্টি দেখাইয়াছেন। ভাসের অতুলনীয় লেখনী চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে বাসবদত্তা চরিত্র চিত্রণে। বাসব-দত্তায় বিকীর্ণ হইয়াছে—"প্রেমের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি-নিরুপম, প্রোজ্জ্বলতম, সর্ব্বত্র রঙে রঙে আলো করা পূর্ণবিভা।"

ভাসের সমুজ্জ্বল নাটকচক্রকে লক্ষ্য করিয়াই দণ্ডী তাঁহার অবন্তী সুন্দরী কথায় বলিয়াছেন—

"সুবিভক্ত মুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তলক্ষণ বৃত্তিভিঃ।
পরতোঽপি স্থিতোভাসো শরীরৈরিব নাটকৈঃ॥"

অর্থাৎ ভাস সর্ব্বদাই রহিয়াছেন আমাদের চক্ষুর গোচরে। তাঁর নাটক অতি সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত মুখাদিযুক্ত, ব্যক্ত, লক্ষণ বৃত্তি সমন্বিত; তিনি চির অমর।

মহাকবি ভাসের বর্ণনীয় বিষয় প্রকৃত মানব চরিত্র চারু বর্ণনায় ভাবায়িত হইয়াছে। তাঁহার নাটকাবলী যেমন অপূর্ব্ব তেমনি রসবৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রসন্ন রাঘবের কবি তাঁহাকে "সরস্বতীর হাস্যরূপে" বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার কাব্যে প্রধান অপ্রধান চরিত্র, বীর, শৃঙ্গার ও হাস্যরসের বৈচিত্র্যময় বিকাশের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনবদ্যবিষয়ের নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। বড় বড় কবি যে রসের সুষ্ঠু প্রয়োগে অপারগ ভাস তাহাতে সিদ্ধহস্ত। চরিত্র চিত্রাঙ্কণের মধ্যে তাঁহার কোন দুর্ব্বলতা দেখা যায় না। ভাসের নিপুণ তুলিকায় বিদুষক কেবল "হাস্যরসপ্রধান নায়কচ্ছায়া মাত্র" নহেন। বিদুষকও অস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী ও শত্রুদের দুর্ধর্ষ শত্রু। তাঁহার রচনা প্রথম যুগের প্রথম রচনা। নাট্যের ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই করিয়াছিলেন প্রোথিত। তাহারই উপর অটল অচল পদে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বের সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস কাব্যের মধ্যে, নাটকের মধ্যে প্রতিভার স্বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নাট্যরূপাবর্ত্তনায় ভাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্ব্ববাদী সম্মত।

তিনি নাট্যসাহিত্যের পদ্ধতির ধার ধারিতেন না। তাঁহার মৌলিকত্ব নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তি সহযোগে কাব্যবীণার ললিত ঝঙ্কারে সর্ব্বজন শ্রুতিগোচর করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা নব নব রসরুচিরা। তাঁহার ভাব যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষাও তেমনি অনির্ব্বচনীয় সরল, সাবলীল। উচ্চারণ মাত্রেই মর্ম্ম স্পর্শ করে।

মহাকবি কালিদাস প্রমুখ লোকমান্য প্রতিভাধর পুরুষ তাঁহার প্রতিভাদ্যুতি সহায়ে আপনাদের প্রতিভার দীপ্তিবর্দ্ধনে সহায়তা পাইয়াছেন। তৎকালিক ক্ষীণ প্রগতির যুগে স্বীয় প্রতিভাপ্রভাবে মানবের হৃদয়বেদনা তথা মর্ম্মব্যথাকে তিনি ভাষায়িত রূপায়িত করিয়াছিলেন আপন লেখনীর অপূর্ব্ব চাতুর্য্য দ্বারা। বর্ণনভঙ্গিমা, চরিত্রচিত্রন, ভাবমাহাত্ম্য শব্দপ্রয়োগ কৌশল প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি একক অতুলনীয়, বরণীয়, মহনীয়। তিনি প্রথম যুগের প্রথম কবি। তিনি রসবেত্তা, রসপ্রনেতা কাব্যরসিক। তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের অনবদ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

কলেজ-স্মৃতি

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল

(প্রাক্তন ছাত্র)

হেতমপুর, বীরভূম

আমার পৈত্রিক বাসবাটী বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরী ইউনিয়নের বহড়ান গ্রামে। আমার মাতামহ ৺গৌরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় হেতমপুর গ্রামের একজন বুনিয়াদী বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ৺শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ৺রামমণি দেবী হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতামহ ৺বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। মাতামহের আলয়ে বাল্যাবধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া এবং স্থানীয় রাজ উচ্চবিদ্যালয় ও কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিয়া আমি ক্রমশঃ হেতমপুরের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং বর্ত্তমানে এই গ্রামেরই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছি।

ইংরাজী ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আমি হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করি। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা হইলেও কলেজে অধ্যয়ন সময়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক দেখিয়াছিলাম অদ্যাবধি তাহা আমার স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে।

তৎকালে কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। আই-এ ও বি-এ ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়া এতদঞ্চলের বহু ধনবান ছাত্র বিজ্ঞানবিষয়ে পড়িবে বলিয়া বহরমপুর কিংবা কলিকাতায় চলিয়া যাইত। বীরভূম জেলায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল পরগণা এলাকায় আর কোন কলেজ না থাকায় এই সব অঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্রই এই বিদ্যায়তনে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিত। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশঃ বিজ্ঞান শিক্ষার চাহিদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারায় আই-এস্-সি পড়াইবার অনুমোদন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে লাভ করিয়া এতদঞ্চলের ছাত্রগণের একটি বড় অভাব দূর করিলেন। এ বিষয়ে ৺কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে; কিন্তু তৎকালে অধিকাংশ ছাত্রই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাইত না। কলেজ গ্রন্থাগারের আলমারিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি সন্নিবেশিত থাকিলেও কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই উক্ত গ্রন্থাদি পাঠ করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিল এবং এই বিরাট গ্রন্থাগার প্রকৃত প্রস্তাবে কলেজের ছাত্রগণের কোন কাজেই লাগিত না। গ্রন্থাগারটি মোটেই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না বলিয়া বহু মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি অযত্ন রক্ষিতাবস্থায় পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরে রক্ষিত বৌদ্ধযুগের গ্রন্থাদির ন্যায় ধূলিপ্রোথিত অথবা কীটদুষ্ট অবস্থায় আলমারীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিত।

কলেজের দ্বিতলে পশ্চিমদিকের একটি লম্বা হলে একটি বড় টেবিল থাকিত এবং উহাকে

Common Room বলা হইত। তাহাতে আগের দিনের দুই একখানি সংবাদপত্র মাঝে মাঝে দেওয়া হইত। সংবাদপত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া Statesman পত্রিকাটি দেখা যাইত। বাংলা সংবাদপত্র অথবা ভাল মাসিকপত্রিকা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শুনা যায়, দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ছাত্রগণ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া কলেজকর্ত্তৃপক্ষ ওই সব পত্রিকা ছাত্রদের সমক্ষে স্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ছাত্রগণ হোষ্টেলে বা নিজগৃহে ওই সব পত্রিকা পাঠ করিয়া নিজেদের চাহিদা মিটাইত। তৎকালে আনন্দবাজার পত্রিকা দুই পয়সা এবং অমৃতবাজার পত্রিকা এক আনা মূল্যে বিক্রয় হইত বলিয়া ছাত্রগণ অতি সুলভ মূল্যে পত্রিকাপাঠের সুবিধা পাইত বলিয়া কলেজের সংবাদপত্র সরবরাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিত না এবং ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকাটির প্রতি ভ্রূকুঞ্চন ছাড়া বেশী ছাত্রকে উহা পাঠ করিতে দেখা যাইত না। কলেজে যে সমস্ত ভাল মাসিকপত্র-পত্রিকা আসিত তাহা সাধারণতঃ প্রিন্সিপ্যাল অথবা অধ্যাপকগণের বাসাতেই আত্মগোপন করিয়া থাকিত। এই কলেজের ছাত্রগণ তৎকালিক জাতীয় আন্দোলনেও পিছাইয়া ছিল না। আমার সহপাঠী শ্রীকালীপদ ঘটক সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ ও কারাবরণ করিয়াছিলেন, সেকথা আমার আজও মনে আছে।

কলেজের আয়োজন অপ্রচুর থাকিলেও শিক্ষাদানের মান অন্যান্য কলেজের তুলনায় এই কলেজে কখনই নীচু ছিল না। আমি এই কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে যে সমস্ত খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এখানে অধ্যাপনা করিয়া এই কলেজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ অতুলপ্রসাদ সেন, অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায়, ৺কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ও ৺শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের অধ্যয়নের সময়ে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপকের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী ও অধ্যাপক ৺শরৎকুমার সেন, ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীলাবণ্য লাল মুখোপাধ্যায়, দর্শনের অধ্যাপক শ্রীবরেন্দ্রনাথ সোম, মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীনীরোদবরণ ভট্টাচার্য্য, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত অধ্যাপকের শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন চমৎকার ছিল যে, তাঁহারা ক্লাশে অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের মধ্যে মোহজাল বিস্তার করিতে পারিতেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনজন অধ্যাপকের অধ্যাপনার মাধুর্য্য আজও আমার স্মরণ আছে। অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী মহাশয় আমাদের সময়ে ক্লাশে সেক্সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" ও "দি টেম্পেষ্ট" পড়াইতেন। ক্লাশে পড়াইবার সময়ে তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ পাইত। সময় সময় বহু ছাত্র বই ছাড়িয়া তাঁহার মুখের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকাইয়া থাকিত। মনে হইত আমরা রঙ্গমঞ্চে সত্যকার অভিনয় দেখিতেছি। একবার যে সমস্ত ছাত্র তাঁহার বক্তৃতা মন দিয়া শুনিত তাহাদের আর বাসায় পড়িবার প্রয়োজন হইত না। দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন ৺শরৎকুমার সেন। তিনি হেতমপুর কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন এবং পরে এই কলেজেরই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া দীর্ঘকাল কলেজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক বালক সুলভ স্বভাব ছাত্রগণের

আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও যে সাধারণ জীবন যাপন করিতেন তাহা তাঁহাকে ছাত্রসমাজে খুবই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ছাত্রদের মধ্যে কি ভাবে জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধি করা যায় তাহা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া কোন্ ছাত্র কিভাবে পড়াশুনা করিতেছে তাহার সংবাদ লইতেন এবং পাঠকালে কোন ছাত্র ভুল পড়িতেছে জানিতে পারিলে যতক্ষণ না সেই ভুল সংশোধিত হইত ততক্ষণ তাঁহার আহার নিদ্রা থাকিত না। কলেজের বাহিরে ছাত্রদিগকে ঐভাবে বিদ্যোৎসাহ দেওয়া ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কাজ। ছাত্রদের মধ্যে তিনি ভাল মন্দ বিচার করিতেন না; বরঞ্চ মন্দ ছাত্রই তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত। তাঁহার মৃত্যু এই কলেজকে একটি প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীলাবণ্যলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা আমি নিয়তই স্মরণ করি। তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও মধুর ব্যবহার ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ইতিহাসের ছাত্রগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে বিশেষ ফল লাভ করিত। ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনে তিনি সর্ব্বদা ছাত্র-গণকে সাহায্য করিতেন। আমার অধ্যয়ন সময় কালে অধ্যাপকগণের অতি সহজ জীবনযাত্রা প্রণালী এবং মহৎ চিন্তাদর্শ অনুসরণযোগ্য ছিল।

আমার সহপাঠী ছাত্রগণের মধ্যে বহু ছাত্রবন্ধুর কথা আজও মনে আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মধুর ভাষী, নির্ভীক ও চরিত্রবান ছিলেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে দুই একজন অগাধ স্মৃতিশক্তির জন্য ছাত্রসমাজে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীকমলাক্ষ ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অতি সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আর একজন ছাত্রবন্ধু শ্রীকমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-শক্তির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ ছাত্র বন্ধুটি অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরী ও লাবণ্যলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বক্তৃতা হুবহু পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। এমন কি, অধ্যাপক তারকব্রহ্ম চক্রবর্ত্তীর লজিকের বক্তৃতার "you see" হইতে আরম্ভ করিয়া ছেদ, পূর্ণছেদ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে অবাক করিয়া দিতেন।

তখন ছাত্রদের মধ্যে সদ্ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার নিবিড় বন্ধন ছিল। নিজেদের প্রচেষ্টায় আমরা কলেজের বাহিরে খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়া লইয়া তদ্বারা নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিতাম। চরিত্র গঠন ছাত্রদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমার অধ্যয়নকালে এমন কোন ঘটনার কথা মনে করিতে পারিনা যেখানে ছাত্র অধ্যাপকের মধ্যে কোন বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্রতার জন্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব এই কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে কখনই দেখা যায় নাই।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে তখন কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। ছাত্রগণের খেলাধূলার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ভাল মাঠ পর্য্যন্ত ছিল না। তবু বর্ত্তমান ছাত্রগণের অপেক্ষায় তৎ-কালীন ছাত্রগণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশী অবহিত থাকায় আপন প্রচেষ্টায় নানাবিধ খেলার ও ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজ নিজ স্বাস্থ্য গঠনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমার সময়ে হেতমপুর গ্রামের শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় ছাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এরূপ স্বাস্থ্য লভে সক্ষম হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সুদৃঢ় বাহুর সাহায্যে মোটর গাড়ী অনায়াসেই আটকাইতে

অন্বিষ্টা

[নীরেন সিংহের "The Quest" কবিতাটির অনুবাদ]

শ্রীআশানন্দন চট্টরাজ
(প্রাক্তন ছাত্র)
হেতমপুর, বীরভূম

(১)

তোমারে খুঁজেছি অনেক অজানা দেশে,
'বোর্ণিও' হতে খুঁজেছি 'আর্কটিকে' ;
'স্কাইস্ক্রেপার'ও পেরিয়েছি অবশেষে,
আরব মরুতে গেছি সেই কথা লিখে ;
যেখানেই ফিরি সেখানেই হাওয়া কয়,
"যাও হে বন্ধু, হেথা নয়, হেথা নয়।"

(২)

অপূর্ব্ব সেই দেশে তবু তোমা খুঁজি,
শুক্রগ্রহের রুপালী আকাশ তলে—
আগ্নেয়গিরি যেথায় চলেছে যুঝি
ভরপুর হয়ে তপ্ত লাভা ও জলে—
সেখানেও মেঘ ফুঁসে চায় মোর পানে,
বলে, "হেথা নয়, যাও হে অন্যখানে।"

(৩)

তাই তো আবার খুঁজি মঙ্গল গ্রহে
খুঁজে মরি তার লালচে মাটির বুকে,
আজব মানুষ যেথা নানা কথা কহে,—
তোমার খবর শুধাই তাদের মুখে ;
অবাক চোখেতে চাহিয়া তাহারা কহে,—
"যাও হে বন্ধু, হেথা নহে, হেথা নহে।"

(৪)

শেষবার তাই খুঁজি তোমা হৃদি কোণে,
খুঁজি আত্মার সকল চাওয়ার মাঝে ;
আছ কিনা দেখি অচেতন এই মনে,
যেখানে নীরবে কামনার ব্যথা বাজে।
এ হেন সময় কে কহিল কানে কানে—
সব দেশ ছেড়ে আছ তুমি এইখানে।

কলেজ স্মৃতিকথা

শ্রীশিবশরণ চৌধুরী
প্রধান অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

পিতৃনিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপ। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম মাতুলালয়ে কৃষ্ণনগরে। নবদ্বীপেই শিক্ষারম্ভ হয়। হিন্দুস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি কলেজে আই-এ, স্কটিশচার্চ্চ কলেজে বি-এ, ইউনিভারসিটিতে এম্-এ অধ্যয়ন করি। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিশনে মাসখানেক ওকালতি করিলাম। ব্যবসাটা ভাল লাগিল না। ভাবিলাম এইজন্যই কি এত খাটিয়া খুটিয়া লেখাপড়া শিখিলাম? ভগ্ন মন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলাম। ভরসা, খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের অবস্থা ভাল করিয়া লইব। ট্রামে এক জায়গায় যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, বন্ধুবর বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ (তখনও তিনি পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন নাই) মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বর্ত্তমানে পাটনায় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি তখন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। কলিকাতায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে মনের দুরবস্থাটা খুলিয়া বলিলাম। সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কলেজে চাকুরী হইলে লইতে পারেন কি?" আমি উত্তর দিলাম, "এই দণ্ডে, এখনই লইব।"

বিমানবিহারী আমাকে সঙ্গে লইয়া তখনই কলিকাতায় ওয়েলেসলি স্ট্রীটের বাড়ীতে মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহিমানিরঞ্জন বীরভূম হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। ইনিই কলেজ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। মহিমানিরঞ্জনের কলিকাতা বাড়ীতে সেই সময় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। মহারাজকুমার আমার সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইলেন, তদুপরি সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও আমার জন্য সুপারিশ করাতে মহিমানিরঞ্জন আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুপারিশপত্র লইয়া আমি যখন হেতমপুরে আসি তখন মে মাস, কলেজ ছুটি হইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গ মন্দিরে সারাদিন থাকিয়া রাজাবাহাদুরের সহিত দেখা করিলাম। চাকুরী হইয়া গেল। বেতন মাসিক আশি টাকা। বড়ি, পোস্ত ও কলাই ডালের আস্বাদন লইয়া কলিকাতা ফিরিলাম। সে ইংরাজী ১৯২৫ সনের কথা। একাদিক্রমে সাতাশ বৎসর কাল কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া ১৯৫৩ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য হেতমপুর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করি।

আমি যখন হেতমপুরে আসি তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ, বি-এল। তিনি এই কলেজেই গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপক থাকাকালে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীধর্ম্মদাস দত্ত। এই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ ভদ্রলোক শ্রীহট্টের কোন এক ধর্ম্মদাস দত্ত, এম-এ, বি-এল এর নাম সাদৃশ্যে হেতমপুর কলেজে অধ্যক্ষের পদাধিকার করেন। পরে ধরা পড়িয়া অপসারিত হইলে ভূপেন্দ্রচন্দ্র অধ্যক্ষ হন।

সে সময়ে কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এগারো জন। অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রচন্দ্র গণিতের অধ্যাপক হইলেও

দর্শনশাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগত সদাচার ও আভিজাত্য তাঁহাকে কি ছাত্র কি অধ্যাপক সকলের চক্ষেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তর্কবিতর্কে নিজের মত আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য তাঁহার একটা জেদের পরিচয় পাওয়া গেলেও মানুষ হিসাবে তিনি ভালই ছিলেন। ভূপেন্দ্রচন্দ্র সাধারণের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদে তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের লইয়া হেতমপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ক্লিষ্টসাধারণের জন্য চাঁদা তুলিতেন।

কলেজের ছাত্র সংখ্যা তখন প্রায় শতখানেক মাত্র। হেতমপুরের পশ্চিমাংশে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের কিছু দূরে শাল মহুয়া জঙ্গলের মধ্যে ছিল মানসায়র ছাত্রাবাস। মহুয়া ও শালগাছগুলির হ্রাস বৃদ্ধি ছিল না। আমি তাহাদিগকে একই অবস্থায় দেখিয়াছি। তাহাদের চেহারা দেখিয়া মনে হইত গরীবের ঘরের ছেলেরা কোনরকমে মাথা খাড়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঋতুপর্য্যায় অনুসারে অবস্থানুরূপ সাজগোজের তাহাদের কমতি ছিল না। বর্ষার শ্যাম সমারোহে তাহারাও নবলাবণ্যে ঝলমল করিয়া উঠিত। পাপিয়ার গানের আবেগকরুণ ঝঙ্কার হয় তো তাহাদের মনকে দোলা দিত। দেখিতাম প্রতি প্রভাতে বন্য ছত্রক কুড়াইবার জন্য তথাকথিত ইতর-শ্রেণীর বালকবালিকাদের হুড়াহুড়ি। শীতে মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ আমাকে অক্ষয় বড়ালের কবিতাংশ মনে করাইয়া দিত —

কুজ্ঝটি সায়াহ্নে হেরি মৃগযুথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর/তীরে চকিতা চঞ্চলা।
মদির মধুর বনে ম্লান জ্যোৎস্নারাতে
লয়ে তুমি বক্ষে শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা।

বসন্তে কোকিল শ্যামার কলঝংকার আমাকে আকুল করিয়া তুলিত। দশ বৎসর আমি মানসায়র বোর্ডিংএ ছাত্রদের মধ্যে বাস করিয়াছিলাম। পরে পৃথক বাসের সুযোগ পাইয়া পরিবারবর্গকে হেতমপুর আনাইয়াছিলাম। কুমার বিশ্বরঞ্জন আমার এই বাসায় বাসের সুবিধা দিয়াছিলেন।

গিরিডাঙ্গা নামক স্থান হেতমপুরের উত্তরে স্থিত প্রান্তরে ছিল গিরিডাঙ্গা কলেজ বোর্ডিং। আর গ্রামের মধ্যে কলেজের কাছে ছিল একটি মেস্। ছোট একটি পুষ্করিণীর নামানুসারে ওই পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী ছাত্রাবাস মানসায়র বোর্ডিং নামে পরিচিত হইতেছে। হেতমপুরে বৃহস্পতি ও রবিবারে হাট চলে। মানসায়র বোর্ডিংএর অদূরেই দুবরাজপুর। মানসায়রের পশ্চিমে মাত্র মাইল খানেক পথ। সোমবার আর শুক্রবার দুবরাজপুরের হাট। এই চারিটি হাটে প্রচুর তরকারীর আমদানী হয়। সে সময় বেশ সস্তা দামেই হাটের জিনিষপত্র পাওয়া যাইত। দুই টাকার উপর দুই এক আনা ধরিয়া দিলেই বেশ ভাল চাউল মিলিত। ডালও বেশ সস্তা ছিল। মাছের সের ছিল ছয় আনা। সরিষার তৈল মিলিত আট আনা। ভইসা ঘির দাম ছিল সের প্রতি এক টাকা দশ পয়সা। আলু পনের আনা অথবা এক টাকা মণ।

মানসায়র বোর্ডিংএ টিফিনের সময় আমরা লুচি খাইতাম। প্রতি মাসে দশ টাকা খরচ দিয়া মানসায়ের বোর্ডিংএ থাকিতাম বলিয়া লোকে মানসায়ের বোর্ডিংএর নাম দিয়াছিল "বাবুদের বোর্ডিং।" সে আমলে তিন টাকা চৌদ্দসিকার একজন ছাত্রের স্বচ্ছন্দে একমাস খাওয়া চলিত।

রাজবাড়ী হইতে মাঝে মাঝে আমরা নিমন্ত্রণ পাইতাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। রাজবাড়ীতে ভোজে কাজে সাঁওতাল

পরগণার খাঁটি ঘি আসিত। মহারাজা রামরঞ্জন ও মহারাণী পদ্মসুন্দরীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বেশ ধূমধামের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে, অধ্যাপকদিগকে ও কর্ম্মচারী দিগকে খাওয়ানো হইত। সরস্বতী পূজাতেও খুব সমারোহ হইত। মেলা বসিত, কলিকাতার থিয়েটার, বীরভূমের কবি, ঝুমরী, লেটোনাচ তিন দিন ধরিয়া চলিত। সাহেব সুবোদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইত। কৃষিশিল্পের প্রদর্শনী কলেজে বসিত ও মেলার শেষে প্রদর্শিত শিল্পদ্রব্যের ও গবাদি পশুর গুণানুসারে তাহাদের মালিকদের পুরস্কৃত করা হইত।

তখনকার দিনে অধ্যাপক-ছাত্র সম্বন্ধ বেশ অন্তরঙ্গপূর্ণ ছিল। কলেজ বর্জ্জন ও অধ্যাপকদের তিরস্কার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমি পুনরায় হেতমপুর কলেজে আসিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ একজন সুযোগ্য অধ্যাপক। কলেজের দ্রুত উন্নতি তাঁহার সংগঠন শক্তির পরিচায়ক। বর্ত্তমানে শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হইতেছে। বর্ত্তমানের জগতে দাঁড়াইয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতেছি—সেকালে ও একালে কত পার্থক্য।

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের এই ষষ্টিপূর্ত্তি উৎসবে মহারাজা রামরঞ্জন ও মহারাণী পদ্মসুন্দরীর পুণ্যকথা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিতেছি রাজা সত্যনিরঞ্জন, মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাকে এবং রাজবংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট কুমার বিশ্বরঞ্জনকে। দুঃখের বিষয় কুমার বিশ্বরঞ্জন ও কুমার রাধিকারঞ্জন অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিলে এই উৎসবের দিনে কত না আনন্দিত হইতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহারাজা ও মহারাণী সাধনোচিত ধাম হইতে তাঁহাদের অতীত কীর্ত্তি এই বিদ্যামন্দিরের ষষ্টিপূর্ত্তি উৎসব প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আশিস্ বর্ষণ করিতেছেন।

দর্শনপথে

শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী, অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

জগতের সমুদয় ধর্ম্ম-মত ও পথ পর্য্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দুইটি দিক্ আছে—আচার ও বিচার। এই আচার বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান আর বিচার অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিকতা। দর্শনের মূলতত্ত্ব হচ্ছে ধর্ম্মের মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিকতা বা প্রকৃতজীবনাদর্শ। উক্ত জীবন ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই ধর্ম্মের বাহ্যিক আচরণ ব্রহ্মচর্য্য শীল, সংযম প্রভৃতির অনুষ্ঠান। যোগসিদ্ধির ক্ষেত্রে সাধনপাদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। তাই তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ হচ্ছে বিবেকখ্যাতি বা কৈবল্য সাধনার সোপান, হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গ যাগযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান পূর্ব্বমীমাংসায় ও শ্রৌত-বিধিতে আছে। কিন্তু উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানকাণ্ডে আছে দর্শন পথের বিচার ও আদর্শ। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে জীবনাদর্শ বা দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ষড়্‌দর্শন ভারতীয় ধর্মসমূহের অস্থিমজ্জা—শোণিত প্রাণ। দর্শন বা তত্ত্ববিচারকে বাদ দিলে কিম্বা পৃথক্ করলে ভারতীয় ধর্ম্ম অচল ও নির্জীব হয়ে পড়ে। ধর্ম্মের মধ্যে তখনই কুসংস্কার ও শিথিলতা এসে পড়ে যখন ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন—সজীবতা—আধ্যাত্মিকতা দূরে সরে যায় বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমানে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে কুসংস্কার এতবেশী জটিল হয়ে পড়েছে যে দার্শনিক মতবাদ শুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত। "তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি বিচারের স্রোতঃপথ রাখে নাই গ্রাসি" এই ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন। ধর্ম্ম ও দর্শন একসাথে আচার ও বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রাণবন্ত ছিল। বর্ত্তমান সমাজজীবনে আমরা ফিরে পেতে চাই ধর্ম্মের মধ্যে জাতীয়তা বোধ, দার্শনিক ভাবধারা, বৈচিত্রের্য মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা, অহিংসা মৈত্রী করুণা-মুদিত শীল ধর্ম্মের প্রাণের সুর। জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় ধর্ম্মের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, শান্তপদ আশ্রমজাত বহু সাধনার ধন ষড়্‌দর্শন ফিরে পেতে চাই।

কপিল, কণাদ, গৌতম, বুদ্ধ, পতঞ্জলি, ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ রামানুজ শঙ্কর প্রভৃতি ভারতের জ্ঞানময় মহাপ্রদীপকে—জাজ্বল্যমান করে গেছেন। ধর্ম্ম ও দর্শন একসঙ্গে পাশাপাশি জড়িত হয়ে আছে তাই গৌতমবুদ্ধ উরুবিল্বের বোধিদ্রুমতলে বলে গেছেন "তাঁর ধর্ম্মপদে" অভিজ্ঞাসচ্ছিকিত্তো ধর্ম্মং।,, অভিজ্ঞা অর্থাৎ সাধনবলে সাক্ষাৎকৃত সত্যীকৃত অনুভূত আচরিত ধর্ম্ম বা অভিধর্ম্ম হচ্ছে দর্শন। বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে 'চতুরার্য্যসত্য' প্রথমে এসে পড়ে। আর্য্যভারতে চতুর্বিধ-সত্য উপলব্ধির উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, বৌদ্ধগণ যে আর্য্য ও বিশিষ্ট নিরাকারবাদী বৈদিক বিজ্ঞানবাদী ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ যাঁরা আর্য্যসত্যকে প্রকাশ করেছেন তক্ষশিলা, নালন্দা, সারনাথে তথা সমগ্র এশিয়া যাঁর শিক্ষার মহাতীর্থে পরিণত তাঁদের পথ ও মত সর্ব্বজনীন। নবধর্ম্ম প্রচারে যিনি অবিশুদ্ধি যক্ষয়াতিশয়যুক্ত বেদের কর্ম্মকাণ্ডের

তথা পশুবলির উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসার যুদ্ধ করেছেন তিনিই সত্যকার বৈদিকধর্ম্ম ও দার্শনিক মত প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছেন। তিনি কখনও হীন ও বেদবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা-কারী নহেন "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহরহঃ শ্রুতিজাতং, সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং, কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে" এই জয়দেব কবি বাণী ধৃত প্রমাণ হলেন বুদ্ধ অবতার। অবতার স্বরূপে যখন বুদ্ধ-দেব প্রতিষ্ঠিত পূজিত, তখন তাঁর ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদ অবৈদিক, অনীশ্বর একথা বলা বড়ই অন্যায়। সংসারে চলার পথে জন্ম জরা ব্যাধি, মরণ, বিচ্ছেদ প্রভৃতির যাঁরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা নিবৃত্তিমার্গে বৈরাগ্যের পথে নিশ্চয়ই আসবেন। তাই নিবৃত্তিমার্গে চলার পথে চতুরার্য্য-সত্য, জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা। ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন দুঃখ কি? দুঃখের কারণ কি? দুঃখ নিরোধ কি? দুঃখ নিরোধের উপায় কি? এই চতুর্ব্যূহ বিচার তাত্ত্বিক। বৌদ্ধমতকে নিয়ে পরে যোগসূত্র 'হেয়ম্ দুঃখমনাগতম্' 'হেয়হেতু' হানোপায় ও 'হান' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আয়ুর্ব্বেদ ও রোগ, রোগের নিদান, রোগের নিবৃত্তি, ও রোগ নিবৃত্তির উপায় এই চারটি তত্ত্ব নিরূপিত হয়। সর্ব্বদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে চিরতরে দুঃখ-নিবৃত্তি।

দুঃখ কি? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয় মিলন দুঃখ। "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং দুঃখায়তনম্" ইহা একটী আর্য্য-সত্য। ২য়—"সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং ক্ষণিকং" ৩য়, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং শূন্যং" ৪র্থ "সর্ব্বং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানং।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্দই দুঃখ। অবিদ্যাই দুঃখের আদি-কারণ। সর্ব্ববিধ পঞ্চস্কন্দ অবিদ্যা হ'তে উৎপন্ন। অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার হ'তে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হ'তে নামরূপ, নামরূপ হ'তে ষড়ায়তন (ষড়িন্দ্রিয়)। সেখান থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা হ'তে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হ'তে উপাদান ও উপাদান হ'তে ভব, ভব হ'তে জন্ম, জন্ম হ'তে বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে। বৌদ্ধনয়ে দুঃখ বা জগতের উৎপত্তিক্রমে বোঝা যায় যে দুঃখ বা জগৎ এক পদার্থ। জগৎ দুঃখকর। এই জগৎ বা দুঃখ নিবৃত্তিতেই পরম নির্ব্বাণ। প্রতি-লোমক্রমে অবিদ্যা পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হওয়া চাই। অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান নাশ না করা পর্য্যন্ত সংস্কারাদি বর্ত্তমান থাকেই, সে কারণ অবিদ্যাকে নাশ করতে চাই অভিজ্ঞা সচ্চীকৃত ধর্ম্ম। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা বা অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি। অবিদ্যা কি? অবিদ্যাই দুঃখ। যোগসূত্রে বলা হয়েছে—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ" অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাম্ "সতিমূলে তদ্-বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" "ক্লেশ মূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ" ইত্যাদি মূল অবিদ্যার মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে জীব জন্মমৃত্যুভোগচক্রে আবর্ত্তিত, মোহগর্ত্তে মমতাবর্ত্তে নিপতিত এই জীবকোটী আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা সেজে সদ্‌অসদ্ যোনিতে জন্ম জরামৃত্যুর বিপাকে মুহ্যমান। দুঃখকষ্টের অভিঘাতে বিপর্য্যস্ত। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাদ্ জিজ্ঞাসা" এই সাংখ্যকারিকায় ও ন্যায়দর্শনের "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এই সূত্রে প্রতিপন্ন হয় যে ত্রিবিধদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। দুঃখত্রয় কি?—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। পশু পক্ষী কীট—পতঙ্গ প্রভৃতি থেকে যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক। বজ্রপাৎ বিদ্যুত, ভূমিকম্প প্রভৃতি থেকে যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক। আর আধি ও ব্যাধি থেকে

যে দুঃখ তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ। এক কথায় আমরা যা চাই তা না পেলে কিম্বা আমরা যা চাই না তা পেলে মনের মধ্যে যে ভাবান্তর তারই নাম দুঃখ। প্রত্যেক জীব চায় সুখ, কারণ আনন্দ হোতেই তার উদ্ভব, আনন্দেই স্থিতি, ও আনন্দেই লয় হয়। কারণ আনন্দময়, চিন্ময় সত্তা হচ্ছে তার। তাই শ্রুতি বলেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি আনন্দ যার স্বরূপ, সে কখনও নিরানন্দ হতে চায় না, দুঃখ তার শত্রু, তাইতো ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ মধু-মক্ষিকা থেকে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীব সুখপ্রাপ্তির আশেই প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছে, কেহ আহারের অন্বেষণে, কেহ বা বিহারের আশায়, কেহ বা বিষয়ে, কেহ ধনে, কেহ মানে, কেহ বা রাজ্যে কেহ বা স্বর্গে 'সুখ' পেতে ব্যস্ত। সুখ কিন্তু দুঃখে বা জগতে নেই। দুঃখই জগৎ। আজ যেটা সুখ বোলে মনে হচ্ছে কাল আবার সেটা দুঃখ বোলে মনে হোল। আত্যন্তিক সুখভোগ কোন বিষয়ের মাঝেই পাওয়া যায় না। দুঃখনিবৃত্তিতেই সুখ। আমার অসুখ হোলো, ডাক্তার এলেন, ঔষধ দিলেন, খেলাম, অসুখ সেরে গেল, কিন্তু আবার ছয়মাস পরে সেই অসুখ হোলো। কৈ ডাক্তারবাবু তো চিরতরে ব্যাধি দমন করতে পারলেন না। রাত্রে ক্ষুধা হলো, অন্নব্যঞ্জনে তৃপ্ত হলেন, পরদিন প্রভাতে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হোলো, কৈ আহার্য্য ক্ষুধার দুঃখকে চিরতরে নিবৃত্ত করতে পারলো না। এইরূপ স্রক্ চন্দন-বনিতা প্রভৃতি বিষয় ভোগে সামযিক দুঃখনিবৃত্তি বা প্রেয় প্রাপ্তি হয় বটে কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ঘটে না। যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি হোলো, আবার পুণ্যক্ষয় হওয়ায় মর্ত্ত্যলোকে আসতে হোলো—কৈ অক্ষয়-স্বর্গ-কামনা চিরতরে সুখ দিতে পারলো না। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং নিবিশন্তে।" কারণ ইন্দ্রেরও দারিদ্র্যযোগ, মর্ত্ত্যে আগমন ও কৃকলাসত্ব প্রাপ্তি শোনা যায়। যাক্ দুঃখনিবৃত্তি করতে গেলে একেবারে চিরকালের জন্য স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আত্মারাম হ'তে হবে। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা এব চাপ্যুরুক্রমে।" ঐ আত্মারাম মুনিদের মত দুঃখত্রয়ের গ্রন্থি ভেদ করতে হবে। সুখ পেতে হলে খণ্ড খণ্ড ক্ষণিক সুখে কাজ নেই, চাই পরমরমরহস্যানন্দনিস্যন্দী নিত্য আত্মারামত্ব। তাই আমি চাই জীবনে জরার পরিবর্ত্তে অজরার—নবযৌবনের, ব্যাধির পরিবর্ত্তে—অব্যাধির নিত্য-নিরাময়ভাবের একান্ত কামনা করি, কারণ 'আমি যে অমৃতের সন্তান। মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃতত্বের শোকের পরিবর্ত্তে আলোকের—নিত্যানন্দের, অন্ধকারের পরিবর্ত্তে—পরমজ্যোতির একান্ত বাঞ্ছা করি। "তমসো মাজ্যোতির্গময়" "অসতো মা সদ্গময়" "মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনা করি।

বেদান্তে যে অঘটন সংঘটন পটীয়সী মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান, সাংখ্যযোগে যাহা জড়া প্রকৃতি, বৌদ্ধদর্শনে যাহা অবিদ্যা তাহার স্বরূপ বিচার-প্রসঙ্গে দেখা যায় যে অবিদ্যা কোন ব্যক্তি বিশেষে বা কোন গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে যাহা সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত তাহা মায়া। এবং যাহা ভক্তি বিশেষে বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাহা গৃহাকাশবৎ খণ্ড মিথ্যাজ্ঞান। ব্যক্তির অবিদ্যা মূলভ্রান্তি, উহা বিজ্ঞান, অভিমান, অহংকারের মূল ভিত্তি। ব্যক্তির অবিদ্যা বস্তুতে অবস্তুজ্ঞান ও অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান। সাধারণে পরিব্যাপ্ত অবিদ্যা নদীর স্রোতপ্রবাহিকা সদৃশ। ইহাতে ব্যক্তির অবিদ্যা নদীতে আবর্ত্তসদৃশ। তাই মায়া বিশ্বপ্রবাহের নামান্তর মাত্র। জগতের অবিদ্যা ও মায়া ধ্বংস হবার নহে। বিশ্বপ্রবাহ বন্ধ হবে

একথা ভারতের কোন দর্শন বলেন না। জগতের অবিদ্যা ও নির্ব্বাণ, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ইহারা একই বস্তুর দুটি দিক্‌মাত্র। ব্যক্তির চক্ষে বিশ্বপ্রবাহ দৃষ্ট হ'বার সময় দুটি দিক্ ধরা পড়ে—একটি গতিশীল (পরিবর্ত্তন ও পরিণামশীল) আর একটি স্থিতিশীল (নিত্য)। জগতের গতিশীল অবস্থা জাগতিক অবিদ্যা বা মায়া। এবং স্থিতিশীল দিক্ পরমার্থ সত্তা চৈতন্যময় নির্ব্বাণ যাহা বেদান্তে ব্রহ্ম। পাশ্চাত্য দর্শনে কাল মার্কস্ বিশ্বের গতিশীল প্রবাহকে স্থান দান করেছেন, আর হেগেল বিশ্ব-প্রবাহের স্থিতিশীল নিত্য পরমাত্মাকে স্থান দিয়ে অদ্বৈতব্রহ্মবাদী হ'য়েছেন।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং চেতি নামরূপমংশপঞ্চকং।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতোদ্বয়ম্॥"

এই বেদান্তপরিভাষাধৃত প্রমাণে সিদ্ধ হয় যে বিশ্ব-প্রবাহের স্থিতিশীল পরমার্থসত্তা ব্রহ্ম, ইহার তিনটি ধারা অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ম্" ইহা ব্রহ্মতত্ত্বের চিরন্তন স্বরূপ, ইহারা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বিশেষ আনন্দচিন্ময়সত্ত্বাবিশিষ্ট নিধর্ম্মক বিশ্বপ্রবাহই ব্রহ্ম। আর বিশ্বপ্রবাহের গতিশীলতায় নাম ও রূপ ক্রিয়া-বর্ণে ও গুণবৈচিত্র্যে 'নানা' তাই ইহা জগৎ। নামরূপব্যাকৃত জগৎ প্রপঞ্চই বিশ্বপ্রবাহের অন্যরূপ। 'নামরূপ বিনির্ম্মুক্তম্ যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ। তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামন্যেকেহপরেহনূন॥" বেদান্তকার নামরূপব্যাকৃত জগতকে মায়া, সাংখ্যকার এই গতিশীল বিশ্বপ্রবাহকে প্রকৃতি ও বৈশেষিক কণাদমুনি এই জগৎকে 'অণু' নামে অভিহিত করেন। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদ্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" এই জগৎ এই মায়া, প্রকৃতি অবিদ্যা নামে বিভিন্ন প্রস্থানে পরিচিত। নামরূপব্যাকৃত এই বিশ্বপ্রবাহ পরমাত্মরূপ আকাশে একটী ব্রততীর ন্যায় বিরাজমান তার ফলফুল হচ্ছে এই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড।

"প্রকৃতির্ব্রততির্ব্যোম্নি জাতা ব্রহ্মাণ্ডসংফলা।"

ব্রহ্মাকাশে অবিদ্যার বিলাসই ভূতভৌতিক সৃষ্টি। "যদ্ অবিদ্যাদিবিলাসেন ভূতভৌতিকসৃষ্টয়ঃ। তং নৌমি পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্" সর্ব্বশেষে উপসংহারে প্রণতি জানাই সেই সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তমকে যাঁর অবিদ্যাবিলাসে বিশ্বপ্রবাহ সতত সঞ্চরমাণ।

হেতমপুর মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্য

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
বীরভূম জেলাবিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক

এক

[এখন থেকে প্রায় একশ বছর পিছিয়ে ঘটনার ধারা অনুসরণ কচ্ছি।

পাড়াগাঁ হলেও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

একটি কিশোরী—সদ্য বিয়ে হয়েছে, প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য প্রদীপটি নিয়ে বাড়ীর তুলসীমঞ্চে, চণ্ডীমণ্ডপে ঘুরিয়ে প্রণাম করে আসবেন।

গন্ধক-যুক্ত কাঠি দিয়ে বারবার চেষ্টা করছেন—বিফলতা এসে তার মুখে চোখে এনে দিচ্ছে নৈরাশ্যের ব্যঞ্জনা।

প্রদীপটি জ্বলে উঠেছে—উজ্জ্বল আলোকে ভরে উঠেছে কিশোরীর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল।

প্রদীপটি হাতে করে কিশোরী এবার তুলসী মঞ্চে প্রণাম করছে।

কিশোরীটির নাম পদ্মসুন্দরী।

গ্রামটির নাম দ্বারকা। জিলা—বীরভূম।]

দুই

একই বাড়ী। কিশোরীটি ঘুমাচ্ছেন এবং স্বপ্নেই যেন কার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। স্বপ্নের নারীটিকে আমরা নাম দিচ্ছি সৃষ্টি।

কিশোরী :—তুমি হাসছ? বিদ্রূপ কচ্ছ? বিফলতা কি হতাশা আনে না! সকলেই কি সব একেবারে ঠিকমত ক'রে যেতে পারে? তুমি পার?

সৃষ্টি :—আমি কি তার জন্য হাসছি। আমি হাসছি এই ভেবে যে একটা সামান্য প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে তুমি হতাশায় ভরে উঠলে—তোমাকে যে গো কত প্রদীপ জ্বালাতে হচ্ছে। তাকাও,—ঐ অদূরে তাকাও, দেখ,—কত সোনা, মণি, মাণিক্য জ্বলছে? ঐগুলোই ত তোমারই জ্বালান প্রদীপ। একটা, দুটো, তিনটে,—পাঁচটা নয়—হাজার হাজার প্রদীপ যে জ্বলে উঠবে।

কিশোরী—কি যে বল হেঁয়ালি বুঝিনে। মণি মাণিক্য, কত কথা বলছ? সত্য করে বলতো তুমি কে? তুমি যে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে কি বলে দাও—ভুলে যাই।

সৃষ্টি—ভুলবে বৈ কি? আমিই যে তোমাকে ভুলিয়ে দিই—না ভুলালে তোমার কাছ থেকে সৃষ্টির আনন্দ পাব কি ভাবে? তুমি হবে আমার রাজকন্যা—তোমাকে দিয়ে আমি ফুটিয়ে তুলব শতদল, সহস্রদল—আর সে পুষ্পের মাধুর্য্য আকর্ষণ করে আনবে শতসহস্রকে—যুগ যুগান্তর ধরে।

ধীরে ধীরে কিশোরী পদ্মসুন্দরী আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

তিন

পদ্মসুন্দরী—শ্বশুরালয়ে। হেতমপুর রাজবাটিতে। রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর অন্দরমহল। রাণী পদ্মসুন্দরী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল আবার সেই সৃষ্টি। রাণী আধা ঘুমঘোরে চোখ খুলে তাকালেন।

সৃষ্টি—রাজপ্রাসাদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস কি তোমার মনে তৃপ্তি এনে দিতে পেরেছে? কই না, তা তো পারে নি—সেদিনও তাহ'লে তুমি

ভিখারি দেখে এমন করে শিউরে উঠলে কেন ?—সেদিও তুমি দরিদ্রের পুত্রের জীর্ণবাস দেখে এমন চমকে উঠলে কেন ?—তুমি ত হারাও নি, নিজেকে খুঁজে বের কর। ছোট্ট প্রদীপটির কথা ভুলে গেছ কি ? সেই কিশোরীকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

পদ্মসুন্দরী—কি যে বল তুমি ? মানুষ কি কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে ? মানবজন্ম যে যুগযুগান্তরের সাধনার ফল। কিছুই তো ভুলিনি। কিন্তু কি যে করি ঠিক বুঝেও যেন উঠি না। সেদিন দেখেছি বিধবা মায়ের বুকফাটা কান্না—ছেলেকে কলকাতা কলেজে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছেন,—ছেলে মানুষও হচ্ছিল, কালব্যাধি এসে ছেলেকে মায়ের কাছ থেকে টেনে দিয়ে গেল। আর একটি প্রাণ আমাকে বড় ব্যাথা দিয়েছে। আমাদের গাঁয়ের বুড়ো তাঁতি মহাপদ্মর ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। আমিই ওর বাবাকে আগ্রহ করে কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠাই। ছেলেটি লেখাপড়াও করছিল, কিন্তু হঠাৎ কি হোল—ছেলেটি বাপমার কাছে চিঠিপত্র বন্ধ করে দিলে—আর তারপর কোন সম্পর্কই রাখল না। বুড়ো আমার কাছে এসে কত কাকুতি মিনতি—'ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন, আমার ছেলেকে এনে দিন।' পারিনে, ওদের কিছুই করতে পারিনে।

সৃষ্টি—কেন পারবে না বোন্,—তোমার হাতে যে রয়েছে অজস্র সম্ভাবনা। তোমার পল্লীতে কি একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারো না ? তোমার শ্বশুর বংশের সকলেই দানের জন্য বিখ্যাত—ঐ যে বিদ্যালয়টি গড়ে উঠছে—তাঁদেরই দানে। তুমি কি তাঁদের জ্বালান প্রদীপটির পাশে আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে পারো না ? তুমি যাদের কথা বলছিলে—সত্যই তো তারা বড় দুর্ভাগ। অভাগিনী মা যদি পুত্রকে কাছে রেখে মানুষ করতে পারতেন, দুর্ভাগ্যময়, পিতা যদি পুত্রকে ভোগ-বিলাসের যথেচ্ছ জীবনের মাঝে না ছেড়ে দিয়ে এখানেই রাখতে পারিতেন, তোমার এ অঞ্চলে শত সহস্র কিশোর—যদি এ স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অন্ততঃ আরো দুটো বছর মহাবিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে যেতে পারত—কত আনন্দের হ'ত। হয়তো বা বুনিয়াদটা আরো একটু দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠলে—পরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে এমনি করে হারিয়ে ফেলত না। বোন, তুমি মনের বল সঞ্চয় কর—রাজাকে বল—দেখবে—দেখবে—তোমার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকবে না।

আমি কে ? আমি তো তোমারই ছায়া, তোমারই স্বপ্ন, তোমার প্রতিভা, তোমার অণু, তোমার পরিবেশ মাত্র।

পদ্মসুন্দরী—হয়ত রাজা সম্মত হবেন, কিন্তু তুমিই বলতো বোন যুগযুগান্তর বয়ে যে স্রোতধারা চলবে, আমার মত ক্ষুদ্র নারী কি সেই আবর্ত্তের, আলোড়নের গতি চির শাশ্বত ছন্দে বেয়ে যেতে পারবে !

সৃষ্টি—কেন বোন ভয় পাচ্ছ ? তুমি ত তাঁরই অংশমাত্র। একটা ধারাকে অব্যাহত গতিতে চলার ছন্দ কে দেয়—! ঐ যে যুবকটিকে দেখছ—তাঁকে টেনে নিয়ে এস তোমার মহাবিদ্যালয়ে। ঐ যুবকটি বড় কেউকেটা নয়—এর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা এবং ধৈর্য্য তিতিক্ষাও অসীম। ইনি হচ্ছেন ডাঃ ভট্টাচার্য্য—এর হাতেই তুমি ছেড়ে দেবে তোমার মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার ভার। দেখবে—দেখবে কালক্রমে একটা মহীরুহই হ'য়ে দাঁড়াবে তোমার এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ।

রাণী পদ্মসুন্দরী—কিন্তু যদিই.........

সৃষ্টি—এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই রাণী। প্রাণ প্রাণের সৃষ্টি করে—এক মহাপ্রাণ চলে যায় পশ্চাতে

রেখে যায় তার পদচিহ্ন। হয়তো মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিরতি—কিন্তু তবু আবার দ্বিগুণ হয়ে, দুর্বার বেগে, উচ্ছল গতিতে চলে তার জীবনের ছন্দ। তুমি ভাবছ তুমি ত অমর নও, রাজাও নয়, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি রাণী মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছা যে সর্ব্বদাই থেকে যায় সকল শিবময় কাজে। তুমি যে ভাবধারা সৃষ্টি করে যাবে—আমি ভবিষ্য-দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পাচ্ছি—দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরেও সে ধারা, সে গতিকে সাবলীল রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন—তোমাদেরই বংশের ভাবী কুলবধু—মহারাজকুমারী জ্যোৎস্নাময়ী। রাজা যে ভাবধারা রেখে যাচ্ছেন—তাঁরই ছন্দ অনুসরণ করবেন—কুমার রেবতীরঞ্জন। আর ঐ যে শিশুটিকে দেখছ—এখনো যাঁর পৃথিবীর আলো দেখবার সৌভাগ্য হয়নি—ঐ শিশুটিই মহাপ্রাণ ডাঃ ভট্টাচার্য্যের গুরুদায়িত্বের অংশ গ্রহণ করবে। তোমার মাটির মহাবিদ্যালয় আরো বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য প্রসারিত হবে। মনকে প্রস্তুত কর। এ শিশুটিকে—এই একদিন সত্যস্বরূপ হ'য়ে প্রমাণ করবে যে সত্য যা তাকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। তুমি বোন কাল থেকেই এ কাজে হাত দিও—দেখবে শতশতাব্দী ধরে তোমার এ মহাবিদ্যালয়ের পাদপীঠতলে আসবে—ভবিষ্য বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, দেখবে তোমার এ মহাবিদ্যালয় হতে যারা বেরিয়ে আসবেন তাঁরা জগতে প্রচার করবেন যে বিদ্যার কোনও অহমিকা নেই, কোন গরিমা নেই, চারিদিকের এই বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যেই তাঁরা জগৎকে দেখাবেন যে—ক্ষুদ্র সে ক্ষুদ্র নয়, বৃহত্তরের সম্ভাবনায় সে পরিপূর্ণ। দেখবে ভবিষ্যতে কেবল ছেলেরা নয় মেয়েরাও এগিয়ে আসবে। মহারাজকুমারী জ্যোৎস্নাময়ীই সে ভার গ্রহণ করবেন—তোমার প্রদীপটি তিনিই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবেন।

ধীরে ধীরে সৃষ্টির ছায়া মিলিয়ে যায়।

চার

হেতমপুর রাজবাড়ী। রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর অন্দরমহল।

রাজা—রাণীর আকাংখা এবার পূর্ণ হয়েছে তো?

রাণী—তা একেবারে পূর্ণ হয়েছে কি—তুমিই বল? দেশের যে যুগ চলছে—এখন সৃষ্টি করা দরকার দার্শনিকেরই নয়, বৈজ্ঞানিকেরও। তুমি ও আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি—আর কতদিন?

রাজা—তুমি এটা ভুল বুঝেছ পদ্ম। ভার কে কার গ্রহণ করে! আমরা একটা কাজে হাত দিয়েছি মাত্র। যুগান্তরের সৃষ্টি তাকে করে রাখবে অমর। আমরা নিমিত্ত মাত্র। তুমি হতাশ হ'য়ো না, আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছি, অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি—স্বাধীনতা না এলে জাতির জড়তা ভাঙ্গে না। এ জাতি স্বাধীনতার সোণার কাঠি স্পর্শ পেলেই জেগে উঠবে চারিদিকে তার অপূর্ব্ব সুষমা নিয়ে—ফুটে উঠবে চারিদিকে তার অপরূপ রূপ—দিকে দিকে দলে দলে ছুটবে ভারতের সন্তান, ভারতের অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডারের দান প্রচার করতে—তখন তোমার এ মহাবিদ্যালয় থেকেও বেরিয়ে যাবে সে সমস্ত জ্ঞানবৃদ্ধ যুবকেরা। শুভদিন আগত প্রায়। আমরা সেদিন দেখে যেতে পারব না সত্য, কিন্তু আমাদের আত্মা তো পরলোক থেকে তা দেখে শান্তি পাবে। দেখবে দলে দলে দেশ-বিদেশে আমাদের ভারতের গৌরব ছড়িয়ে পড়বে।

পাঁচ

ইংরাজী ১৯৫৮ সাল

জানুয়ারী, ২৩শে

নেতাজীর জন্মদিবস

হেতমপুর কলেজের হীরক-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলছে। কলেজের পুরাতন কাগজপত্র

হ'তে কলেজের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের চেষ্টা চলছে। দেখা গেল ঘরের এক কোণে একটি যুবক—একখানা পুরাণো বই পড়তে পড়তে—হঠাৎ যেন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বইখানা হাতে করে সে তার ইতিহাসের অধ্যাপকের কাছে ছুটে গেল—

যুবক—দেখুন, দেখুন, আমাদের কলেজ সম্বন্ধে এক বিদেশী কি চমৎকার কথা বলেছেন—

"এটা পরম বিস্ময়ের বস্তু যে যখন ভারতের চারিদিকে বড় বড় সহরেও কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সফল হয়ে উঠে নি—অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন এবং অবাস্তব বলেই অনেকে হয়তো হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে—তখন একজন অসূর্য্যম্পশ্যা মহীয়সী মহিলা রাজ-অন্তঃপুরে থেকেও পল্লী অঞ্চলে শিক্ষাকে সুগম করার জন্য—পল্লী কলেজ স্থাপনের এমন এক পরিকল্পনা বের করেছেন—পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার সুপ্রসারের জন্য। এ কেবল ভারতেই সম্ভব—ভারতের নারীতেই সম্ভব। যে জাতির মাতৃজাতি অন্তঃপুরে থেকেও এ প্রকার শুভপরিকল্পনায় ব্রতী হতে পারেন—সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

সমবেত ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আপনা হতেই, অজ্ঞাতসারেই যেন দেখতে পান তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই মহীয়সী মহিলা এবং অজ্ঞাতসারেই তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করেন।

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

আমাদের কলেজ

(শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল)
প্রধান শিক্ষক, হেতমপুর রাজ উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১৭ সালে হেতমপুর রাজ স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আসি। একই বাড়ীর নীচের তলায় এই স্কুল, উপর তলায় কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। একজন কেরাণী, চারিজন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষকে লইয়া ছোট্ট কলেজ—কেবল ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী। স্কুল ও কলেজ কার্য্যতঃ দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবেই পরিচালিত হইত। এক বাড়ীতে দুই গৃহস্থ বাস করিলে যে ছোটখাট বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা যে একেবারে হইত না তাহা নহে। তবে এই সকল ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ অফিসিয়াল, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইত না।

তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের সম্বন্ধে কিছু লেখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস দত্ত পরে জাল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সজ্জন ছিলেন। ইংরাজি পড়াইতেন। লর্ড লিটন ও বিশপ ফিসারকে তিনি পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাঁহারই সময়ে কলেজে বি, এ ক্লাশ খোলা হয়। তিনি এখন পরলোকে। রেক্টর ও পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন। কিন্তু ভাল টেনিস খেলিতে পারিতেন। কোলিয়ারির কার্ক উড সাহেবকে তিনি ছাড়া আর কেহ টেনিস খেলায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহার অগাধ। তখন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রাখা হইত না। শরৎবাবুই ইতিহাস পড়াইতেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজন হইলে তিনি ইংরাজি, গণিত এমন কি সংস্কৃতও পড়াইতেন। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার মোটেই ছিল না। এখানে আসার পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানে যত দিন ছিলেন তত-দিনই দিল্লীর বাসার ভাড়া মাসিক চল্লিশ টাকা করিয়া গুণিতেন। কারণ সেই বাসায় তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার রক্ষিত ছিল। পুস্তকগুলি নিশ্চয়ই পোকায় কাটিতেছিল। এখনকার বাসায় (বর্ত্তমান কবিরাজ খানায়) একদিন রাত্রিতে সাপ বাহির হওয়ায় উহাকে মারিবার জন্য অন্য কিছু পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি একখানি মোটা বাঁধান বই বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের এখানেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরদিনই তিনি কলেজে আসিয়া কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে চাকুরিগ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপের কথা বেশ মনে আছে। আমি তখন অজাতশ্মশ্রু বালক। তিনি অনেক প্রবীণ, আমার নস্য লওয়ার বদ অভ্যাস ছিল এবং এখনও আছে। আমি নস্য লইতে-ছিলাম। এমন সময় তিনি আসিয়া পড়ায় সঙ্কুচিত হইলাম। তিনি বালকের মত হাসিয়া বলিলেন "I see, we have the same hobby. কৈ দিন আপনার নস্যি কেমন দেখি। Exchange is no robbery."—এই বলিয়া আমার সহিত নস্য বিনিময় করিলেন। ইহাই প্রথম আলাপ। ইনিও আর ইহ জগতে নাই।

সংস্কৃতাধ্যাপক দুর্গামোহন শাস্ত্রী অনেক বয়ো-জ্যেষ্ঠ হইলেও আমার সতীর্থ ছিলেন। আমি তাঁহাকে দাদা বলিতাম। অমায়িক মানুষ, ভিতর বাহির এক—খাঁটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইনিও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীঅনিল বরণ রায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। রূপবান্ পুরুষ। পারিবারিক অশান্তি থাকিলেও গান, বাজনা নাট্যাভিনয়ে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। এখনও তাঁহার বিল্বমঙ্গলের অভিনয় আমি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি। বক্তৃতা শক্তি ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব। বহুক্ষেত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সিউড়ির এক জনসভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের বক্তৃতা করার কথা। বিপুল জন সমাবেশ। অকস্মাৎ সংবাদ আসিল সুরেন বাবু আসিতে পারিবেন না। যাঁহারা সুরেন্দ্র নাথের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টা অনিল বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তেই গৃহে ফিরিলেন। এখান হইতে অনিলবাবু বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে যোগদান করেন। এখানে আসিতে আসিতেই ইংরাজিতেও এম, এ পাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন ও পরে বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার জীবন চরম পরিণতি লাভ করে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে—পণ্ডিচেরী আশ্রমে। তিনি এখনও সেখানেই তপস্যারত আছেন। কিন্তু আমাদিগকে ভুলেন নাই। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক ধর্ম্ম-পিপাসুদের পিপাসা মিটাইতেছে।

তদানীন্তন গণিতাধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কথা সকলেরই মনে আছে।

পরবর্ত্তী অধ্যাপকগণের মধ্যে ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার ও ৺শরৎ কুমার সেন ও শ্রীলাবণ্য লাল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। বিমানবাবু এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও মনীষা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। তিনি কিছুদিন মানসায়ারে বাসা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন এক ষাঁড় তাঁহার বাসায় উপদ্রব করে। এই প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া তিনি ষণ্ডকাহিনী নামক একটি হাস্যরসাত্মক রচনা (সম্ভবতঃ দেশ পত্রিকায়) লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে পি এচ., ডি এবং পি, আর, এসের নিবন্ধ রচয়িতার লেখনী প্রসূত এই জাতীয় লঘু সাহিত্য লেখকের প্রতিভার অসামান্য নমনীয়তার সূচক। তিনি পরে আরা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে বিহারের কলেজ সমূহের পরিদর্শকরূপে কার্য্যরত আছেন।

৺শরৎ কুমার সেন ছিলেন স্থানীয় লোক। ইংরাজির অধ্যাপকরূপে দীর্ঘকাল কাজ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। অমন অমায়িক আপন ভোলা লোক আজকাল দুর্লভ।

শ্রীলাবণ্য লাল মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে দেশ জোড়া-খ্যাতি আছে। বিমানবাবুর পরে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং দীর্ঘকাল যশের সহিত অধ্যাপনা করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

পল্লীমহিলা স্বর্গীয়া মহারাণী পদ্ম সুন্দরী দেবী পল্লীবালকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আজ সরকারী আশ্রয় প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজে পরিণত হইয়াছে। আই, এস্‌সি শ্রেণী বহুপূর্ব্বেই খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বি, এস্‌সি ও অনার্স শ্রেণী খোলার আয়োজন চলিতেছে। আশা করা যায় যে এই মহাবিদ্যালয় বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় ও সুদক্ষ অধ্যাপক-গণের কর্ম্মকুশলতার ফলে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

নিবেদন

মহারানী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
নদীয়া হাউস

আঁধারে মোর জীবনভরা
নেইকো আলো ছায়া।
দেখবো কবে বল তোমার
ভুবন উজল কায়া॥

যবে তুমি হৃদয়ে মোর
উদয় হবে এসে।
তোমার রূপে আমার মনের
আঁধার যাবে ভেসে॥

তারই লাগি নয়ন আমার
অশ্রু ভেজা করো
তোমার পূজার তরে হৃদয়
ভক্তি রসে ভরো॥

যত বাঁধন তুমিই তো নাথ
ছিঁড়লে নিজ হাতে।
কোমল কলি না ফুটিতেই
লোটে ধুলির সাথে॥

তোমার দেয়া হাসা-কাঁদা
তোমার দেয়া জ্বালা,
তোমায় নিয়েই সাজাই আজি
তোমার বরণ ডালা॥

পূজার থালায় আছে আমার
যতেক ব্যথার দল।
পাদ্য নিয়ে আছি আমি
আমার আঁখির জল॥

দিব পদে অর্ঘ্য রূপে
আমার আশা যত।
স্মৃতির ছলে বেঁধেছি তাই
দুখের ভাষা কত॥
বাসনা ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে
সইবো দহন আমি।
অদৃষ্টদীপ আশার বাতি
তাই নিবেদি স্বামি॥
এস প্রভু, এস তুমি
নীরব রাতে মম।
ফুলের ডালা শুক্‌নো মালা
নাও তুলে উত্তম॥
জীবন যাহার ব্যর্থ আজি
প্রতিষ্ঠা না এলো,
ফুল বিলায়ে যে চিরদিন
কাঁটার আঘাত পেলো,—
সেই আমি আজ সবকে ছেড়ে
তোমায় শুধু চাই ;—
যাবার আগে প্রাণের ঠাকুর
চরণে দাও ঠাঁই॥

—o—

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ স্মৃতি

শ্রীনবগোপাল দে, বি. এল্,
(প্রাক্তন ছাত্র)
দুবরাজপুর, বীরভূম

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হেতমপুর রাজ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হই। অধ্যয়নের কাল ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দ।

তখন হেতমপুরে আই-এ পর্য্যন্ত পড়ানো হইত। কলেজে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, লজিক, গণিত ও ফিজিক্স্ বিষয়গুলি পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল।

কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৮০-১০০। সময় মত কিঞ্চিৎ অধিক ছাত্র হইত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছাত্ররা আসিয়া পড়িত। আমাদের সময় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেকছাত্র আসিয়া কলেজে পড়িত। কলেজের বেতন ছিল চার টাকা। বোর্ডিং চার্জ ৮৲ হইতে ১০৲ ও বাজে খরচ ২৲ হইতে ৩৲ লইয়া মোট ১৬৷১৭৲ টকোর মধ্যে বিদেশী ছাত্রদের পড়া হইত। এত সস্তায় কলেজে পড়ার ব্যবস্থা বাংলাদেশে কোন কলেজে ছিল না। বোর্ডিং বলিতে মানসায়ের বোর্ডিংকে বুঝাইত। তখন পূর্ব্বদিকের অ্যাস্‌বেস্‌-টসের ছাদযুক্ত ব্লকটি হয় নাই।

কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী বলিতে অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাসদত্ত, আচার্য্য শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য অনিলবরণ রায়, আচার্য্য ভূপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে ইনি অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন), আচার্য্য শরৎচন্দ্র সেন ও আচার্য্য দুর্গাপদ শাস্ত্রী ছিলেন। এই ছোট পরিবেশে অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বেশ একটু যোগাযোগ ও হৃদয়ের টান ছিল।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে হেতমপুর রাজাদের সহিত মানসায়ের বোর্ডিংএর ছাত্রদের সরস্বতী পূজা উপলক্ষে থিয়েটার দেখা লইয়া বিরোধ হয়। সেই বিরোধের ফলে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অক্ষয় কুমার সেন ও সমস্ত অধ্যাপকমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়া কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সেই সাথে মানসায়ের বোর্ডিংএর বহু ছাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়া যান। সেই শিক্ষক ও ছাত্রবিপ্লবের ফলে হেতমপুর রাজপরিবারের সহিত কলেজের কঠোর শাসনের সম্বন্ধ শিথিল হয়।

কলেজের নানা দুর্নীতির তদন্ত আরম্ভ হয়। তৎ-কালীন বীরভূম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কলেজ কিছু-দিন বন্ধ থাকে। কলেজ ইনস্পেকটর ৺ডাঃ পি, কে, রায় মহোদয়ের তদন্তকালীন কলেজের বারান্দার কাঠের রেলিং ভাঙিয়া পড়ে। ভগবৎ কৃপায় ডাঃ রায় হেতমপুর স্কুলের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক করুণাবাবুর দ্বারা রক্ষা পান, নচেৎ তিনি বারান্দা হইতে নীচের তলায় পড়িয়া যাইতেন। তাহার ফলে বারান্দার লোহার শিকের রেলিং হয় কলেজ বাড়ীর নানা উন্নতি সাধিত হয়।

/ পূর্ব্বোক্ত ছাত্র ও শিক্ষক বিপ্লবের পর অধ্যক্ষ / ধর্ম্মদাস দত্ত প্রমুখ অন্যান্য অধ্যাপগণ কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে যোগদান করেন। ধর্ম্মদাস দত্ত মহাশয় নিজেকে iron curtain এর মধ্যে রাখিয়া খুব ষ্টাইলের উপর থাকিতেন। খ্যাতনামা অধ্যাপক

ও কলেজের রেকটর শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ অধ্যাপক মণ্ডলীর সহিত মেলামেশা করিতেন না। শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেন, "দেখ অনিল ও ভূপেন, তোমরা একদিন দেখিবে এই ধর্ম্মদাস দত্ত কখনও এম, এ ডিপ্লোমাধারী নন, নচেৎ তিনি শিক্ষিত লোক হইয়া আমাদের সহিত মিশিবেন না কেন?" শরৎচন্দ্রের এই ভবিষ্যৎবাণী ১৯২৪-২৫ সালে সফল হইয়াছিল।

তখন আমি কলিকাতায় ল' কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে থাকি। এমন সময় আগুনের ফুলকির মত চারিদিকে সংবাদ রটিল হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস দত্ত জাল এম্, এ তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরবি ঘোষ মহাশয়ের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমি ও আমার বন্ধু বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি এখন আসানসোল বারের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল) ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে যাইয়া পরীক্ষার ফলাফলের ক্যালেণ্ডার খুঁজিতে আরম্ভ করি। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় দুইজন ধর্ম্মদাস-দত্তর নাম পাওয়া যায়। তৎপর এম, এ ও ল' পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মদাস দত্তর নাম পাওয়া গেল। আমাদের হোষ্টেলের সহপাঠী শ্রীশৈলেশ করের নিকট সংবাদ পাইলাম, এই ধর্ম্মদাস দত্ত শ্রীহট্টের খ্যাতনামা উকীল এবং তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঘোষের সহপাঠী। শ্রীহট্টের উকীল শ্রীধর্ম্মদাস দত্তকে চিঠি লেখা হইলে তিনি পত্রোত্তরে জানাইলেন তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মদাস দত্ত এবং হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস দত্ত জাল ডিপ্লোমাধারী। অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমার নকল সংগ্রহ করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করিয়াছেন।

এই অবস্থার পর ধর্ম্মদাস দত্ত রেঙ্গুনে চলিয়া যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক দেশপূজ্য ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহার সহিত তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া মনোমালিন্য চলিতেছিল। অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস দত্তের পিতা কলিকাতা শাঁখারীটোলার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ট্রোলার এ, সি, বোসের বন্ধু ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজ্জত রক্ষার জন্য শ্রীযুত বোসের হস্তক্ষেপে ধর্ম্মদাস পর্ব্বের যবনিকপাত হয়।

আচার্য্য অনিল বরণ রায়ের কর্ম্মময় জীবন হেতমপুরেই আরম্ভ হয় তিনি দর্শন ও ইংরাজী সাহিত্যের এম্, এ ছিলেন। তাঁহার লজিকের বক্তৃতা মন দিয়া শুনিলে আর বাসায় পড়িবার প্রয়োজন হইত না। ইংরাজীও পড়াইতেন। আমাদের সময় Vicar of Wakefield পড়াইতেন মনে হইত Vicar স্বয়ং বক্তৃতা দিতেছেন। ছেলেদিগকে অধ্যাপনাকালে মাতাইয়া রাখিতেন। তাঁহার রসগ্রাহী বক্তৃতা এমন হৃদয়স্পর্শী ছিল যে ছেলেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তিনি হেতমপুর থাকাকালীন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্বর্গত কর্ম্মবীর গুরুসদয়দত্ত আই, সি এস্ তখন বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেড। বাঙ্গালী যুদ্ধবিদ্যার অনুপযুক্ত—এই প্রবাদ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ডাঃ মল্লিকের প্রেরণায় বাঙালী ডাবল্ রেজিমেন্ট গঠন হয়। গুরুসদয় দত্ত ও শ্রীঅনিল বরণ বিপুল উদ্যমে বীরভূমে সৈন্য সংগ্রহের জন্য সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅনিল বরণের ওজস্বিনী বক্তৃতায় বীরভূমের বহু জওয়ান সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। পরে তিনি

হেতমপুর কলেজ ত্যাগ করিয়া বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে যোগ দেন।

আমাদের কলেজ ত্যাগের পর রাজা সত্যনিরঞ্জন হেতমপুর কলেজকে I. A. হইতে I. A., I. Sc ও B. A ষ্ট্যাণ্ডার্ডএ পরিণত করেন। তজ্জন্য বহু দরিদ্র ছাত্রের উচ্চতর শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। দেশবাসী তাঁহার নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কলেজটি B. A. ষ্ট্যাণ্ডার্ড এ পরিণত হইলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে যথা সিউড়ীতে, রামপুরহাটে ও বোলপুরেকলেজ স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমানে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক সপন্সরড হওয়ায় ইহার উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান অধ্যক্ষের পরিচালনায় কলেজটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

শপথ যে তার মুখে

অজিতকুমার পাল
সহকারী, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ গ্রন্থাগার

ঘরের কোণেতে চেয়ে দেখি যবে এক কণা দানা নাই,
শুধু প্রেয়সীর তুইটী গণ্ড গেছে নোনাজলে ধুয়ে,
উপায়বিহীন তখন কিছুর কিনারা না খুঁজে পাই
গড়ে তুলি শুধু স্বপ্ন সৌধ ছেঁড়া চাটায়েতে শুয়ে।

ফুটো চাল দিয়ে বর্ষার জল টুপটাপ শুধু ঝরে
কোলের ছেলেটা ক্ষিধের জ্বালায় করে ওঠে চীৎকার
'আমি যে বেকার' এই কথাটাই তখন যে মনে পড়ে—
তুয়ারে যখন হানা দেয় এসে আমার পাওনাদার।

তবুও বন্ধু, সূর্য্যের আশে আমি যে গো বসে থাকি
প্রতিটী প্রহর গুণি তুরু তুরু বুকে
নিশ্চিত জানি উঠবেই ডেকে সকাল বেলার পাখী
আগামী দিনের শপথ যে তার মুখে।

সম্পাদকীয়

অনেকেই আশা করে থাকেন সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্ঞানগম্ভীর নূতন তথ্যের। তাঁদের সে আশা পূর্ণ করবার সামর্থ্য বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদকের নেই,—একথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখাই সমীচীন। আমাদের এই কলেজ পূর্ব্বে যা ছিল, বর্ত্তমানে যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি দিতে পারে তার নানান্ বিবরণ পাওয়া যাবে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের রচনায়।

বর্ত্তমান সংখ্যাটী প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ—যাঁদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল—বর্ত্তমান অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এবং আমাদের বীরভূম জেলাবাসী সাহিত্যিকবৃন্দের কাছে শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে লেখা পাঠাবার জন্য আবেদন করেছিলাম। অনেকে আমাদের আবেদন রক্ষা করেছেন, অনেকে কর্ম্মব্যস্ততায় আমাদের আবেদন রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁহাদের সকলের কাছেই সম্পাদক কৃতজ্ঞ। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

লেখাগুলো সাজানোর ব্যাপারে সর্ব্বদাই যে লেখার মান বিচার করা হয়েছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে লেখা বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ পর পর না দিয়ে বৈচিত্র্যের জন্য ভিন্ন বিষয়ক লেখা মাঝে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের কলেজ জীবনে হীরক জয়ন্তী। হীরক-জয়ন্তী উৎসব দুদিনের। দুদিনের জন্য কর্ম্মচাঞ্চল্য, প্রাণবন্যা, নানা উৎসব,—তারপর নিস্তরঙ্গ গ্রাম-জীবনের একঘেয়েমি এই উৎসবের আনন্দকে দেবে মুছে। যা'তে এই আনন্দের একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকে তার জন্যই এই বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশ। ভবিষ্যতে ছাত্রদের কাছে জয়ন্তী সংখ্যাটীর মূল্য কম নয়। এর থেকে তারা জানবে তাদের কলেজের পিছনকার ইতিহাস, তারা জানবে তাদের কলেজ পশ্চিমবাংলায় শিক্ষাপ্রসারে যা দিয়েছে তার তুলনা নেই, তারা জানবে কত জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং তাঁদের কলেজের হীরক-জয়ন্তী উৎসবে এই সব কৃতী অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদস্থ ব্যক্তিগণ নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে, শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। ভবিষ্যতের ছাত্রদের ওপর এর সম্মিলিত প্রভাব নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়।

যে হীরক-জয়ন্তীর সংবাদপুষ্ট হয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হ'ল, তার প্রচেষ্টা চলছিল অনেকদিন থেকেই, তখন আমাদের কলেজ সরকারী স্পন্‌সর্‌ড্ কলেজ হয়নি। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়। এই কলেজে তিনি সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেছেন। কলেজের আসন্ন ষষ্টিপূর্ত্তি (১৮৯৭—১৯৫৭) উপলক্ষে এই জাতীয় একটি উৎসবের স্বপ্ন বোধ হয় তাঁর মনে জেগেছিল। তাই তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবেই বোধ হয় তিনি ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে সংবাদপত্রে দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপন,—এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের তাঁদের নাম ঠিকানা জানাবার জন্য। কিন্তু অর্থ কোথায়? অধ্যাপকগণ যখন কয়েকমাস মাহিনা না নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন হীরক-জয়ন্তী উৎসবের অর্থ

আসবে কোন্ কুবেরের ভাণ্ডার থেকে ? স্বপ্ন গেল ভেঙে। প্রাক্তন ছাত্রদের নাম কলেজের খাতায় জমা রইল। অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় ১৯৫৬ সালের ১৮ই নভেম্বর বিদায় গ্রহণ করলেন কলেজের ষষ্টিপুর্ত্তি উৎসবের ভাঙা স্বপ্ন বুকে ক'রে।

অর্থের চোরাবালিতে যে স্বপ্ন-প্রাসাদ তলিয়ে গেল তাকেই পুনরুদ্ধার করলেন অধ্যক্ষ সেন গুপ্ত মহাশয়ের নবীন উত্তর সাধক অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। অর্থের সঙ্কট তখন নেই, কলেজ হয়েছে তখন স্পন্‌সরড্‌, অধ্যাপকবৃন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নূতন ক'রে ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হ'ল। একটু দেরী হয়ে গেলেও ১৯৫৮ সালের ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হ'ল বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু প্রতীক্ষিত হীরকজয়ন্তী উৎসব। অধ্যক্ষ সেন গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি।

এই কলেজের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বোধহয় তিনিই দিতে পারতেন—এর উত্থানপতনের কাহিনী তাঁর চাইতে ভাল কেউ জানেন না। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি কোন লেখা দিতে পারেন নি। তবু তার কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহবাণী। যাঁদের কাছথেকে পেয়েছি লেখা, পেয়েছি উৎসাহ তাঁদের সকলকেই আবার জানাচ্ছি আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা,—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
ফাল্গুন ১৩৬৪

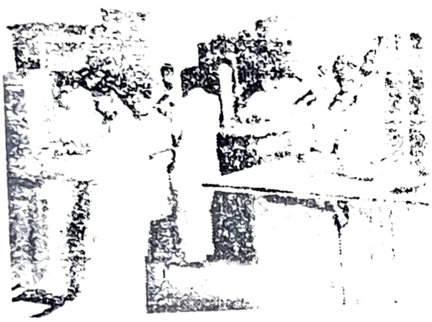
কলেজের বিভিন্ন বিভাগ



বিজ্ঞান ভবন



ছাত্রদের পাঠাগার



[illegible]াগার ([illegible])



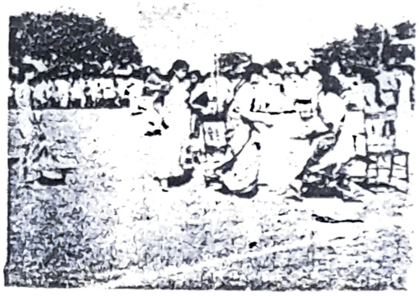
ছাত্রাবাস ([illegible])



কলেজ ভবন

আলোক চিত্র—শ্রী[illegible], [illegible]।

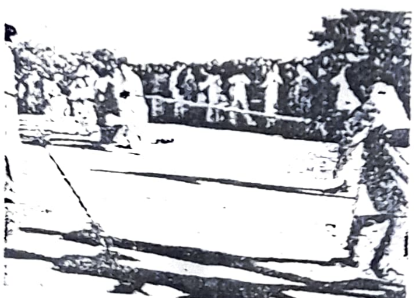
কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণের দৃশ্য



ছাত্রীদের মিউজিক্যাল চেয়ার (প্রারম্ভ)



ছাত্রীদের মিউজিক্যাল চেয়ার (সমাপ্তি



প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের টাগ্ অব ওয়ার

আলোক চিত্র—শ্রীঅমল সেনগুপ্ত, কলিকাতা—৩১

হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে

বর্ত্তমান ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত "আরোগ্য নিকেতন"এর

এবং

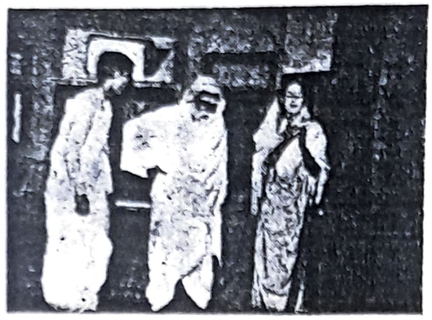
প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত

"মরা হাতী লাখ টাকা"র বিভিন্ন দৃশ্য



"আরোগ্য নিকেতন"এর একটি দৃশ্যে

(বাম হইতে) আতর বৌএর ভূমিকায় শ্রীতারাপদ মিত্র, অভয়ার ভূমিকায় শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং মতির ভূমিকায় শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী।



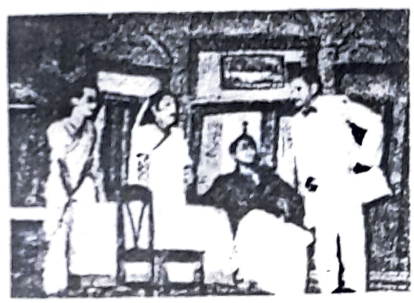
"আরোগ্য নিকেতন"এর একটি দৃশ্যে

(বাম হইতে) কিশোরের ভূমিকায় শ্রীআলোক মুখোপাধ্যায়, জীবন মশায়ের ভূমিকায় শ্রীসাতকড়ি সরকার, এবং আতর বৌএর ভূমিকায় শ্রীতারাপদ মিত্র।



[illegible] হাতী লাখ টাকা"র অপর একটি দৃশ্যে

(বাম হইতে) [illegible] হালদারের ভূমিকায় অধ্যাপক [illegible], টাকার ভূমিকায় শ্রীভোলা দত্ত, একবড়ির ভূমিকায় অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত এবং [illegible] ভূমিকায় অধ্যাপক নরেন্দ্র নাথ মুখার্জি।



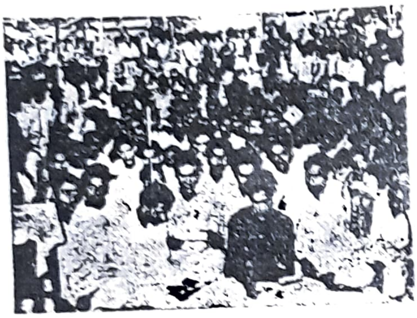
"মরা হাতী, লাখ টাকা"র একটি দৃশ্যে

(বাম হইতে) টাকার ভূমিকায় শ্রীভোলা দত্ত, লক্ষী [illegible] ভূমিকায় ভূদেব আচা[illegible], একবড়ির ভূমিকায় অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এবং অতুল দত্তের ভূমিকায় শ্রীহরি রায়।

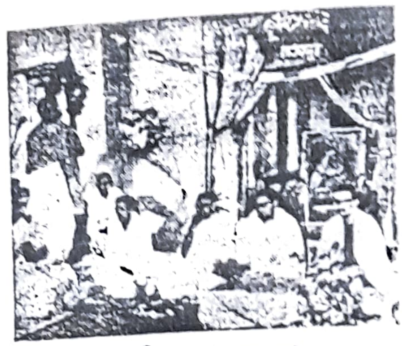
আলোক চিত্র— মঙ্গল সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৩২

হীরক জয়ন্তী উৎসবের

বিভিন্ন দৃশ্য



হীরক জয়ন্তী সভার একাংশ



সাহিত্য সভার দৃশ্য

(বাম হইতে) বক্তৃতারত অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক, (মঞ্চে উপবিষ্ট) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।



প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতারত
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও
তাঁহার ছাত্রছাত্রী

আলোক চিত্র—শ্রীঅমল সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৩২

অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

হেতমপুর

আজ হ'তে ৬১ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছিল বীরভূমির প্রাচীনতম এই কলেজ। হেতমপুর গ্রামের কীর্ত্তিমতী মহারাণী পদ্মসুন্দরী প্রতিষ্ঠিত করেন এই বিদ্যায়তন বাংলার একটি নিভৃত পল্লীতে বাংলা সন ১৩০৩ সালে, ইংরাজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

সেই অবধি বহু নূতন পুরাতনের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে এই বিদ্যামন্দির অগণিত বিদ্যার্থীর সারস্বতবেদী রূপে। কতো কৃতী ছাত্র এসেছেন, শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, বড় হয়ে গেছেন এখানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে। কতো কৃতবিদ্য অধ্যাপক তাঁদের কর্ত্তব্যকুশল শিক্ষাব্রতকে পালন ও উদ্‌যাপন করে গেছেন কলেজের প্রতিটি কক্ষে। তাঁদের সরল উদার জীবন যাপন, নামমাত্র দক্ষিণা গ্রহণেও সন্তুষ্টি, অথচ শিক্ষক জীবনের গুরু দায়িত্ববোধ কতো ছাত্রের মনে জীবনাদর্শের গভীর রেখাপাত করেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

হীরক জয়ন্তীর উৎসব মুখরিত প্রাঙ্গণে, আজিকার শুভদিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের স্মরণ করি, প্রণাম করি।

আর প্রণাম জানাই তাঁদের, যারা সুপরিকল্পিত করেছিলেন নিরালা গ্রামের মধ্যে এমন একটি কলেজ যা শত শত পল্লী বালকের উচ্চ শিক্ষালাভের সাধ মিটিয়েছে, দরিদ্র ছাত্রের উচ্চাভিলাষ পূরণের সহায়ক হয়েছে। ঘরের খেয়ে গ্রামের স্কুলে পড়ে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, অথচ ব্যয়ভারে বাইরে পড়তে যাওয়ার সুযোগ যাদের ছিল না, তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা হয়ত উন্মুক্ত হোতনা কোনদিন, যদি না থাকত গ্রামের এই কলেজ, নামমাত্র মাহিনা এবং ছাত্র-বাসের সুলভ বন্দোবস্ত।

এতদঞ্চলের দরিদ্র ছাত্র ও অভিভাবকের করুণ আকুতি বোধ হয় করুণাসিক্ত করেছিল মহারাণী পদ্মসুন্দরীর মাতৃহৃদয়। তাই দেখি, সন ১৩০২ সালে ফাল্গুন মাসে তাঁর [illegible] প্রতিষ্ঠা করেছিল হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। নিয়ম কানুনের বাঁধ দিয়ে তিনি সম্পাদন করেন তাঁর "ব্রজবালা ট্রাষ্ট" নামক নির্দ্দেশপত্র, মুখবন্ধে যার স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এই কথা:

"তদ্ভিন্ন এই প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ না থাকায় এদেশস্থ বালকগণ বিদ্যাধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানলাভে বঞ্চিত ছিল। স্বামী মহাশয় দেশের উপকারার্থে উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী টোল এই হেতমপুর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে বহু বহু বালক সকল অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নিকটে উচ্চ শিক্ষার স্থান না থাকায় তাহারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না জন্য আমার সম্পূর্ণ মন ঐ সকল বালক ও দেশস্থ অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক সকলকে বিদ্যাদান অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা দেওন জন্য একটি কলেজ স্থাপন করি এবং তাহা করিবার কল্পনা স্থির করিয়াছি।"

শুধু যে তিনি কলেজ স্থাপন করেছিলেন, তা নয়। যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজ অভাবগ্রস্ত না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি অতিক্রম করেনি।

উক্ত নির্দ্দেশ পত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করেন:—

"(২) দফায় লিখিত সৎকার্য্য সকল চিরকাল স্থায়ী থাকে এজন্য স্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত (ক) তপশীলের সম্পত্তি এবং নিজ স্বকীয় (খ) তপশীলের সম্পত্তি সকল ঐ সকল কার্য্যে এবং অন্যান্য সৎকার্য্য সকলের ব্যয় জন্য ট্রাষ্ট অর্পণ করিলাম ও তাহা ঐ সকল কার্য্যের জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি হইল এবং ঐ ট্রাষ্ট সম্পত্তি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মোহিনী দাসিকা দেবীর অন্যতর নাম "ব্রজবালা" নামে খ্যাত হইবে অর্থাৎ ব্রজবালা ট্রাষ্ট ষ্টেট বলিয়া খ্যাত হইবে।"

মহারাণী পদ্মসুন্দরীর শ্বশুর অর্থাৎ মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর পিতা হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র। পরম স্নেহের পুত্রবধূ

পদ্মসুন্দরী তাই তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তির সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন পূজ্যবর শ্বশুর কৃষ্ণচন্দ্রের নাম।

নির্দ্দেশপত্রের মধ্যে লিখিত রয়েছে এ কথা।' 'আমি দেশস্থ বালকদিগের অধ্যয়ন জন্য আগামী বর্ষের প্রথম হইতে কলেজ স্থাপন করিব। ঐ কলেজ আমার পূজ্যবর শ্রীশ্রী৺শ্বশুর মহাশয়ের নামে অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নামে খ্যাত হইবে, তাহার উদ্যোগ করিতেছি।"

এ উদ্যোগ তিনি করেন বাংলা সন ১৩০১ সালের ১৪ই ফাল্গুন অর্থাৎ ঠিক ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুরাতন পঞ্জী (ক্যালেণ্ডার) হতে জানা যায় যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩০২ সনে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ স্থাপিত হয় শুধু এফ, এ পড়ানোর কলেজ রূপে। সরকারীভাবে অনুমোদন প্রাপ্তিতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত হতে বোধ হয় কয়েক মাস গত হয়। তাই পরবর্ত্তী পঞ্জীতে দেখা যায় উদ্বোধনের দিন ২৭শে জুন ১৮৯৭।

পুরাতনত্বের দাবীতে অবিভক্ত বাংলার ত্রয়োবিংশতি (২৩) কলেজ হচ্ছে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ এবং নড়াইল ও উত্তরপাড়া কলেজকে যথাক্রমে মহকুমা সহরের ও সহরতলীর কলেজ ধরলে, অবিভক্ত বাংলায় সর্ব্বপ্রথম গ্রাম অঞ্চলের কলেজ হিসাবে গৌরব লাভ করে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। সুতরাং সহরমুখী সেকালের ইংরাজী শিক্ষা তথা শিক্ষায়তনগুলির একটা দিক্ পরিবর্ত্তন সূচিত হয়েছে এই সুপ্রাচীন কলেজের মাধ্যমে। হেতমপুর এ নিয়ে গর্ব্ব অনুভব করে।

১৮৯৬ হতে ১৯২২ পর্য্যন্ত এ কলেজে শুধু এফ, এ ও পরে আই, এ পড়ানো হোত। অনুমোদিত বিষয়গুলি ছিল; ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞান।

১৯২৩ সালে বি, এ পাশ কোর্স পর্য্যন্ত পড়ানোর অনুমোদন লাভ হয়। ই কয়টি বিষয়ে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, দর্শনশাস্ত্র, গণিত ও ইতিহাস।

১৯৪৫ সালে এ কলেজে আই, এস সি কোর্স প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৯৪০ সালে আই' এ ক্লাশে পৌরনীতি ও ১৯৪৬ সালে বি, এ ক্লাসে অর্থনীতি পড়ানোর অনুমোদন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাওয়া যায়। তদবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আই, এ, আই, এস-সি ও বি, এ ক্লাশ সহ এই কলেজ চলছে।

এতদঞ্চলের ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ার আগ্রহ এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কলেজের পরিচালকমণ্ডলী এখানে বি, এস-সি ক্লাশ খোলার আবেদন জানিয়েছেন। আশাকরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে বর্ত্তমান বর্ষ ১৯৫৮ সাল হতে এখানে বি, এস-সি পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানাগার বা ল্যাবোরেটরীর জন্য অতিরিক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ বাবদ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা অর্থমঞ্জুরীর সূচনাপত্র ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগ হতে পাওয়া গেছে। তাছাড়া এজন্য বাড়তি অধ্যাপক ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম বাবদ অর্থসাহায্য ও ব্যবস্থাদি পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা বিভাগ করছেন। আশা করা যায়, কলা ও বিজ্ঞান (আর্ট ও সায়েন্স) পাশ ও অনার্স বিভাগ সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ শীঘ্রই আত্ম-পরিচয় দিতে সমর্থ হবে।

গ্রাম অঞ্চলের কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশবাসীর নিকট বিশেষ দাবী রাখে। ভালো কিছু পড়বার জন্য ভালো-ছেলের দল সহর মুখে ছুটবে বা ছুটতে বাধ্য হবে, এ অবস্থা সঙ্গত নয়। নগরীর অনাবশ্যক ভিড়, উপযুক্ত আলো-বাতাসের অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলতা এবং সেখানের অবাঞ্ছিত রাজনীতির উগ্র ঝাঁঝ ছাত্রমনে প্রতিকুল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। অথচ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে অনার্স নিয়ে পড়া স্নাতকদের একটা জাতীয় প্রয়োজন রয়েছে। তাই এ প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে সেই সব আঞ্চলিক কলেজ যাতে যোগ্য অধ্যাপনা এবং পঠন পাঠনের উপযোগী বই বা সরঞ্জামাদির অভাব থাকবে না।

শান্ত পরিবেশে, গ্রাম্য জীবনের ধুলামাটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কম খরচায় এতদঞ্চলের ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়বার সুযোগ পাক কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে, এই আমাদের একান্ত কামনা। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ব্যবধান আমাদের এখানে নাই, একথা সগৌরবে জানাতে পারি। মাটির ঘরে বাস করা অধ্যাপক মানুষটিকে প্রতিবেশী ছাত্ররা এখানে প্রতি দিন দেখতে

অত্যন্ত। অধ্যাপকের বাড়ীর উৎসবে আনন্দে তাই ঘরের ছেলের মতোই ভিড় করে ঘুরে বেড়ায়, এবং অংশ গ্রহণ করে তারা। অধ্যাপক জীবন তাতে তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত বোধ করে। কলেজের অনতিদূরে অবস্থিত অধ্যাপক ভবনের খড়ের চালায় আজও এই কলেজের প্রবীনতম অধ্যাপক পায়চারি করছেন অথবা বাঁশের মোড়ায় বসে আছেন, আর তাঁর অবসর সান্নিধ্যে বি, এ ক্লাশের ছাত্রগণ ম্যাকবেথ বা বার্কের কথা শুনছে উবু হয়ে বসে—এ দৃশ্য আজও চোখে পড়ে। জটিল সমস্যা পীড়িত তথা নানানতর জটপাকানো মানুষের মনে ক্ষণেকের তরেও যদি এই গ্রামের কলেজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের পরিপাটি এনে দিতে পারে, তাহলে আমরা তাতে গর্ব অনুভব করব।

আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে বিগত ৬১ বৎসরে এ কলেজ অনেক ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে। ব্রজবালা ট্রাষ্ট স্থাপন কালে মহারাণী পদ্মসুন্দরী বরাদ্দ করেন কলেজের জন্য বার্ষিক ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা ও কলেজ মেরামতি বাবদ ১০০৲ টাকা। ছাত্র সংখ্যা এ কলেজে কোনদিন খুব বেশী ছিল না, বেতনের হারও ছিল কম; মাসিক ৪৲ টাকা মাত্র। তবু কোনোমতে চলে যেত। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ হেতমপুর রাজ পরিবার হতে নানাবিধ সাহায্য পেতেন পাল পার্বনে এবং গ্রামবাসীর শ্রদ্ধাপূত দান উপহারাদি তাঁদের স্বল্প বেতনকে পরিপুষ্ট করত।

১৯২৩ সালে যখন বি, এ ক্লাশ খোলা হয় তখন হতে ট্রাষ্টের বার্ষিক বরাদ্দ ৯,১৫০ টাকা করা হয়। ১৯৪৫ সালে যখন আই, এস-সি ক্লাশের অনুমোদন লাভ হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ত অনুযায়ী ট্রাষ্ট বার্ষিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা করেন। এবং ১৯৪৯ সালে তা আরো বাড়িয়ে বার্ষিক ১২০০০৲ টাকা করা হয় কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। ১৯৫১ সালে ছাত্র সংখ্যা কমে গিয়ে আই, এ; আই, এস-সি ও বি, এ ক্লাশ মিলিয়ে হয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬৩। টাকার অভাবে অব্যবস্থা, অব্যবস্থার জন্য ছাত্র কমতি আর ছাত্র কমতির জন্য আরো টাকার অভাব এই দুষ্টচক্রের মধ্যে কলেজ হয়ে পড়ে অত্যন্ত অনটনগ্রস্ত। তার উপর সে সময় বিহার সরকার কর্তৃক ট্রাষ্টের জমিদারী বিলোপ আরও সঙ্কটজনক করে তোলে এ কলেজের আর্থিক বুনিয়াদ।

ডি, পি, আই গ্রান্ট-ইন্-এড এ কলেজ আগে পেত না। ১৯৪৮ সাল হতে মাসিক ৫০০৲ টাকা গ্রান্ট বরাদ্দ হয়। কিন্তু তবু সঙ্কুলান হোতনা। পুরাতন অধ্যাপকগণ অনেকে এসময় বিদায় নেন। ১৯৫৪ সাল হতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় ছাত্রসংখ্যা বাড়ার জন্য। এদিকে বিহার সরকার কর্তৃক জমিদারী গ্রহণের পর হতে ট্রাষ্টের দরুণ টাকা তখন পাওয়া যাচ্ছিল না এবং কলেজ সত্যসত্যই আসন্ন দুর্দ্দিনের অপেক্ষায় দিন গুণছিল মাত্র। ব্রজবালা ট্রাষ্টের বর্ত্তমান ট্রাষ্টিগণ অবশ্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কলেজের অর্থাভাব মেটাতে। কলেজের সুবিধার্থে তাঁরা প্রায় ৭২ বিঘা ধানের জমি বন্দোবস্ত করে দেন এসময়। এবং বিহার সরকার হতে প্রাপ্তব্য বার্ষিকী বা "এ্যানুইটি"র দুই তৃতীয়াংশ (আনুমানিক ৩৪ হাজার টাকা) কলেজের অনুকূলে দিতে স্বীকৃত হন।

এ হেন সময় এসে পড়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্পনসর্ড স্কিম বা সরকার উদ্যুক্ত কলেজ পরিকল্পনা, যাতে ছাত্র-সংখ্যা বা ছাত্রদত্ত বেতনের অনিশ্চয়তার উপর দুলতে হয় না কলেজের আর্থিক বুনিয়াদকে, যে কোন উপায়ে ছাত্র পাকড়াও করার ঘৃণ্য পন্থা নিতে হয় না যে পরিকল্পনায়।

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ পরিচালক মণ্ডলী সাদরে গ্রহণ করলেন এই স্পনসর্ড স্কিম। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই হতে সরকার উদ্যুক্ত কলেজ হিসাবে গ্রহণ করলেন এই কলেজকে।

বিগত এক বৎসরের মধ্যে কলেজের আর্থিক উন্নতি সুস্পষ্ট। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট হতে এক বৎসরে বিভিন্ন খাতে পাওয়া যায় ৬৩,৫৫০৲। ওই অর্থে কলেজ বিল্ডিং মেরামত গ্যাসপ্ল্যান্ট ক্রয়, লাইব্রেরী ও ক্লাশঘরের আসবাব এ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।

রাজপরিবারের অর্থানুকূল্যে সায়েন্স ব্লকটির কিছুটা তৈরী ছিল। তার নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে। লাইব্রেরীতে অনেক নূতন বই আনা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক বিভাগে

অনেক বই এসেছে। কলেজ গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। ছাত্রাবাস "মানসায়র" এবং অধ্যাপক ভবনগুলির অনেকাংশে সংস্কার করা হয়েছে। কলেজে এ বৎসর হতে ছাত্রীদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় বিনা খরচায় ছাত্রেরা যাতে চিকিৎসা ও ঔষধ পেতে পারে তার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মহারাণী পদ্মসুন্দরী চেয়েছিলেন তাঁর সৎকার্য্য সকল চিরস্থায়ী থাকুক। কিন্তু বিপুল সম্পত্তি সত্তেও কালচক্রে কলেজের আর্থিক বুনিয়াদ একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে আর, পরবর্ত্তী কালচক্রে সরকারী পরিকল্পনার আনুকুল্যে আবার তা নূতনতর দৃঢ়তা লাভ করে। যাঁদের চেষ্টায়, আগ্রহে এবং দূরদর্শিতার ফলে এ সম্ভব হল তাঁরা কলেজের একান্ত শুভানুধ্যায়ী এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন।

আশঙ্কা ও সংকোচ যে একবারে ছিল না তা নয়। পুরাতন দিন হতে যাঁরা অধ্যাপনা কার্য্যে এখানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা নূতন অবস্থার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবেন কি না এই ছিল সন্দেহ। কিন্তু সুখের বিষয় যে সকলেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। পারদর্শী কমিটির নিকট উপস্থিত হয়ে সকলেই সুযোগ্য বিবেচিত হয়ে বর্দ্ধিত হারে বেতন পাচ্ছেন। কলেজের দরিদ্র কর্ম্মচারী, পিওন সকলেরই বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। তাদের সকলের সহযোগীতা কর্ম্মকুশলতা ও আন্তরিকতা এই কলেজকে উন্নত হতে উন্নততর করবে, এ আশা আমরা রাখি।

ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। বর্ত্তমান বর্ষে ছাত্র সংখ্যা প্রায় পৌণে চারশত। তার মধ্যে ছাত্রাবাসে থাকে প্রায় ১৯২ জন। ছাত্রাবাস আরও প্রয়োজন। আশা করা যায় আমরা সরকারী সাহায্যে আগামী বর্ষে নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করতে পারব। শাল ও মহুয়া বনবেষ্টিত ৪২ বিঘা জমি যা হেতমপুর রাজপরিবার কলেজকে দিয়েছেন তাতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের নব নব বাসস্থান এ কলেজকে শ্রীমণ্ডিত করবে। তাদের মিলিত জীবনাদর্শ বিনিময়ে উদগীত হবে সেই বেদবাণী : সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্য্যম্ করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ছাত্র ও অধ্যাপকদের কাছাকাছি বাসব্যবস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবনীতির সূচনা করে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা ছিল। নানা পরিবর্ত্তনের বন্যায় তা আমরা হারিয়েছি। বাঁধাধরা ঘণ্টার উদ্‌গ্রীবতায়, ট্রামবাসের ধাক্কায়, পরনির্ভরশীল বাস ব্যবস্থায়, এবং সর্ব্বোপরি সমাজজীবনের নানা সংঘাতে ছাত্র-শিক্ষকের যে যোগসূত্র লুপ্ত প্রায়। যদি বা কিছু ছিল তাও নানা অবাঞ্ছিত তাপে উদ্বায়ু হয়েছে। যারা এর পুনরুদ্ধারের চেষ্টাকে শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করছেন, তাঁরা সত্যই শ্রদ্ধেয়। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বর্ত্তমান বর্ষে অধ্যাপকদের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য পঃ বঙ্গ সরকার হতে ১৫০০০৲ টাকা আমরা পাব। আশা রাখি, একটি মিতব্যয়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে এদিক দিয়ে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হতে পারব।

শুধু ঘরবাড়ী বা ইটকাঠ দিয়েই একটা বিদ্যায়তনের উন্নতি সূচিত হয় না তা আমরা জানি। এখানকার অধ্যাপক মণ্ডলী সেদিকে সচেতন। একদিন এখানে প্রথম বিভাগে পাশ করা ছাত্র খুব বেশী আসত না। তবু তাদের নিয়ে যতটুকু শিক্ষানুশীলন করা সম্ভব তা হয়। ক্লাশের পড়ার সহায়ক হিসাবে ক্লাশের বাইরে তাদিকে যতটুকু উৎসাহ দেওয়া যায় তার জন্য লাইব্রেরীর একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। পাঠ্য পুস্তক অনেক পরিমাণে তাদের জন্য রাখা হয়েছে। বুক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। বই কেনার সামর্থ্য অনেকের নাই। এই বুক ব্যাঙ্ক হতে ১২৭৬৲ টাকার পরিমাণ বই গত ৮ মাসে ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই বুক ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা চালু থাকলে আশা করা যায় পাঁচ বৎসর মধ্যে আমরা কলেজের শতকরা পঞ্চাশটি ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করে গরীব অভিভাবকদিকে অনেকাংশে সাহায্য করতে পারব।

হেতমপুরকে কেন্দ্র করে ১৪ মাইল মধ্যে আজ অবস্থিত রয়েছে পাঁচটি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়। পরিবর্ত্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এই সব বিদ্যালয় হতে আগামী দুই বৎসর মধ্যে একাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে যে সব ছাত্র বেরুবে, তাদের জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রি-বার্ষিকী ডিগ্রী কলেজ। উন্নততর শিক্ষার মান নিয়ে শিক্ষাগৌরব যুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ যদি তাদের আহ্বান জানাতে পারে, তাদের উচ্চ শিক্ষাভিলাষ পূর্ণ করতে

পারে, তাহলে তার বিগত ৬১ বৎসরের গ্রাম্য অস্তিত্ব সত্যই ফলপ্রসূ হবে, সার্থক হবে।

বহু খ্যাতনামা অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক এই প্রাচীন বিদ্যামন্দিরের পূজারীর আসন গ্রহণ করে গেছেন। প্রথম অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেছেন ডক্টর যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯৯ হতে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন পর পর অক্ষয় কুমার সেন, শরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য, রাধিকা মোহন চৌধুরী, অতুলচন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস দত্ত ও শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত।

তারপর এক বৎসর অতীত হল এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বর্ত্তমান নিবেদকের উপর। নূতন অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলবার কাজে কতখানি অগ্রসর হতে পারছি, তার বিচার করবে ভবিষ্যৎ।

পুনর্গঠনের কাজে যাঁরা সহায়ক হয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষে আজকার সভায় উদ্বোধক মহাশয় যিনি অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ব্যক্তিগত উৎসাহ দিয়ে বাংলার প্রাচীন ও প্রথম গ্রাম্য কলেজটিকে ভালভাবে গড়ে তোলার পথে সাহায্য করছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

হেতমপুর গ্রামে আজও জীবিত রয়েছেন এ কলেজের প্রবীণতম ছাত্র শ্রীনীলরতন সেন। ১৮৯৮ সালে কলেজে প্রবেশ করেন তিনি এবং ১৯০১ সালে পাশ করেন এফ, এ। তিনি সাক্ষ্য দেবেন, কতো নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানী গুণী ছিলেন, সেদিনের অধ্যাপকগণ, কতো কর্তব্যকুশল ছিলেন সে যুগের অধ্যক্ষ।

তাঁদের সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। তাই ৬১ বৎসর পরে আবার কলেজের জয়যাত্রা নূতন করে বিঘোষিত হচ্ছে হীরক জয়ন্তী উৎসব মাধ্যমে।

আজিকার শুভদিনে তাঁদের শুভাশীর্ব্বাদ ঝরিত হোক কলেজের প্রতি কক্ষে ও প্রাঙ্গণে। সমাগত সুধীবৃন্দের শুভ কামনা প্রতিধ্বনিত হোক বিদ্যায়তনের সকল প্রকোষ্ঠে। জগদ্গুরুর সমীপে প্রার্থনা, যাঁর আলোকে বিশ্ব আলোকিত, তিনি হউন আমাদের দীপবর্ত্তিকা।

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

সাহিত্যসভায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণের সারাংশ

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে যে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়েছে তাতে একটি বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এই বিতর্কের অবতারণায় ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ নেই, কবিতা সম্বন্ধে পাঠকমহলে মতভেদ থাকতে পারে। কবিতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় সামঞ্জস্য সুসংগত হতে পারে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী কাব্যের রস আস্বাদন করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা হল তার থেকে এই সত্যই পরিস্ফুট হল যে কবি আধুনিক জীবন থেকে সরে গেছেন। কিন্তু এই সত্য আমাদের ভুললে চলবে না যে যিনি মহাকবি তিনি ক্ষণিক আবর্ত্তনে বিচলিত হন না। কুজ্ঝটিকার পরমায়ু ক্ষণিক। একটু রৌদ্রের পরশ পেলেই তা ছিন্ন হয়ে যায়। জীবনের যে ক্লিন্ন মূর্ত্তির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে আমরা পরিচিত হচ্ছি তা সাময়িক বিপর্য্যয়, কুড়ি পঁচিশ বছর পরে তা কেটে যাবে। তখন আমাদের মনে কোন সুর বাজবে? জীবনের পরম ঐক্য তখন কোন বেদীমূলে নিবেদন করব তা ভেবে দেখা দরকার। শাশ্বত মানদণ্ড কাব্যের বিষয়বস্তুর বিচার করার প্রয়োজন আছে। রাত্রির নানারূপ আমরা চোখে দেখি। কিন্তু রাত্রির কোন রূপটা চিরন্তন? রাত্রির কুৎসিত রূপ না তার শাশ্বত রূপ? বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কালজয়ী কবিতা রচনা করা যায় না। ক্ষুধার সময় ভাতই ভাল। রবীন্দ্রকাব্য নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তার থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে অন্নের মূল্য রবীন্দ্রকাব্যের মূল্য থেকে অধিক। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির কাছে তিক্ত কষায় জল হীরকের থেকে বেশী মূল্যবান। কিন্তু তাতে এটা প্রমাণিত হল না যে হীরকের কোন মূল্য নেই বা তিক্ত কষায় জলের মূল্য হীরকের থেকে বেশী। মানুষের সহজ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে কবি কবিতা রচনা করেন, সাময়িক বিপর্য্যয়কে কেন্দ্র করে নয়।

বিকারের কাব্য, বিভ্রান্তির কাব্য, ক্ষুধার কাব্যেরও বিচার করতে হলে শাশ্বত মানদণ্ড আবিষ্কার করতে হবে। শুধু অভাবের প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে কাব্যের শাশ্বতকে বিচার করা চলে না। প্রতি কাব্যের অন্তরালে বিরাজ করে একটা শাশ্বত আদর্শ। তাকে অবহেলা করা চলে না। সৌন্দর্য্যের রূপ পরিবর্ত্তনশীল, চসারের যুগে সৌন্দর্য্যের যে রূপ আমরা অবলোকন করেছি, স্পেনসারের যুগে তা আমরা দেখি না এবং স্পেনসারের যুগে যা আমরা দেখেছি তা সেকস্পীয়ারের যুগে দেখতে পাই না, ড্রাইডেন ও পোপের যুগে যা দেখেছি পরবর্ত্তী যুগে তা অস্বীকৃত হয়েছে। শেলী, কীটস ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থকে কেন্দ্র করে একটা নতুন রোমাণ্টিক কাব্যের যুগ আরম্ভ হয়েছে। যুগে যুগে রুচির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও একটা শাশ্বত সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডে আসতে হবে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা সহজ বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু একটা জায়গাতে এসে আমাদের থামতে হবে। সৌন্দর্য্যের-যে একটা শাশ্বত রূপ, যার মানদণ্ডে কাব্যের বিচার হবে তাকে মেনে নিতে হবে। আধুনিক কবিদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে আমরা যে চিত্র পাই তার মধ্যে দেখছি সমাজের নানা বিকৃতি রূপ লাভ করেছে। কিন্তু এ রচনা ভাল লাগছে কেন? তার কারণ বিকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। বিকৃতিকে বরখাস্ত করলে চলবে না। কারণ আধুনিক মানুষের কামনা বাসনার মধ্যে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। তবু মনে রাখতে হবে এর একটা শাশ্বত দিক আছে। এই অসংযত, আশাহীন সৌন্দর্য্যেরও কোন মনস্তাত্ত্বিক রূপ আবিষ্কার করা যেতে পারে। কাব্য সৌন্দর্য্যের বিচারের জন্য ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার প্রয়োজন। কোন কোন কবি সাময়িক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় তাদের কাব্যে শাশ্বত কিছুই নেই। প্রকৃত কবি নূতন নূতন অনুভূতির ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। কেবলমাত্র নূতন নূতন ভাবলোক জয় করা নয়, তাকে সৌন্দর্য্যের শাসনে রাখাও কবির প্রয়োজন। জ্ঞান বিজ্ঞানের দর্শনের ক্ষেত্রে যে কোন চিন্তা উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে চিন্তা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপাদান। কবিকে দেখতে হবে নূতন উপহারে মানুষের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারলুম কিনা। যেমন খাদ্য তৈরী হল নানা উপাদান দিয়ে। কিন্তু সে খাদ্য সুখাদ্য হল কিনা, রসনার গ্রহণশীলতার দ্বারাই তার বিচার হবে, কাব্যজগতে শুধু নতুন চিন্তা হলেই হবে না। আরও দেখা দরকার সৌন্দর্য্যের দ্বারা মার্জ্জিত হয়ে সৌন্দর্য্যের চিরন্তন নিয়মের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। সৌন্দর্য্যের বিধান প্রতিষ্ঠিত কাব্যের ইন্দ্রজালের গণ্ডীর মধ্যে এ নূতন ভাবকে স্থান গ্রহণ করতে হবে। প্রতি পাথরেই বিগ্রহ হয়। কিন্তু প্রতি ভাবেই কাব্য হয় না। ভাবের সংস্কৃত, মার্জ্জিত রূপের প্রয়োজন আছে।

কাব্যের অগ্রগতি মানে বিষয়ের বৈচিত্র্য নয়। বিষয়ের বৈচিত্র্যকে আহ্বান করব তখনই যখন তা সৌন্দর্য্য কেন্দ্রিক। কোন চিন্তা কাব্য রাজ্যে গ্রহণ করব, কোন চিন্তা গ্রহণ করব না তার বিচার হবে বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের শাশ্বত রূপ প্রকাশ পেয়েছে কিনা।

বিজ্ঞানের বিস্ময় সর্ব্বক্ষেত্রে কাব্যের বিস্ময় নয়। যে বিস্ময় আমরা কাব্যে প্রত্যাশা করি তা মানুষের অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। Sputnik চিন্তা জগতে এক বিরাট বিপর্য্যয়। কিন্তু এটা বহিরঙ্গজীবনের বিস্ময়। এর সঙ্গে মানবমনের অনুভূতির কোন যোগ নেই এ বিস্ময় জড়জগতে অনুভব করি, অন্তরের সৌন্দর্য্য পরিমণ্ডলে কোন স্থায়ী বিস্ময় তা সৃষ্টি করতে পারে না। এটা ধূমকেতুর মতই ক্ষণিক স্থির জ্যোতি রূপে চিদাকাশে তা বিরাজ করবে কিনা চিন্তার বিষয়।

আজকাল কবিতা ছাড়াও কবিতা লেখার অন্য পন্থা আমরা দেখেছি, তা হল গদ্য। তাকে আমরা কাব্যিক গদ্য বলতে পারি। যাঁরা এ ভাবে কবিতা লেখেন তাঁরা বলেন যে যদি মনে এমন একটা অনুভূতির সঞ্চার হয় যার প্রকাশব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে অন্তরের প্রয়োজন খালি থেকে গেল, তাকে গদ্যের রূপ দেওয়া যেতে পারে, কাব্যের রূপ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। কবির মনে ভাব বিহ্বলতা আসে। তিনি গদ্যে না লিখে তাকে কাব্যে প্রকাশ করেন, তাঁর অনুভূতির মধ্যে যে চমৎকৃতি

আছে তা প্রকাশ করতে গেলে কাব্যলোকের মাধ্যমেই তাকে প্রকাশ করতে হয়, গদ্যে প্রকাশিত হলে বোঝা যায় যে সে ভাব পরিপক্ক নয়। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়নি গদ্য কবিদের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক বা সূর্য্যালোক নয়, নীহারিকার অস্ফুট রূপ। পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার মত ধৈর্য্য হয়ত কবির তখন ছিল না। কবির মন যদি নিবিড় ভাবে আলোড়িত না হয় তাহলে কাব্যের রূপ প্রকাশ পায় না, নিবিড় আত্মচেতনার মধ্যে কবি যেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেখানে কাব্যরূপ না দিয়ে তিনি পারেন না, যে কেন্দ্রশক্তি সৌরমণ্ডলে বিরাজ করে তা কবির মনেও কাজ করে। কবি তার কক্ষপথ পরিত্যাগ করতে পারেন না, এই কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হলে বিপর্যায় ঘটে, এই কেন্দ্রীয় শক্তি কবির মনে কাজ করে কারণ কবির চিন্তাধারা নিয়মিত ও সুসংবদ্ধ।

মহৎ কবিতার অন্তরালে বিরাজ করে এক মহান আদর্শ, আদর্শের মেরুদণ্ড না থাকলে মহৎ কবিতা রচিত হয় না, অনেক তুচ্ছ বস্তু আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তা সকল ক্ষেত্রে শাশ্বত নয়, মনের সাময়িক মেজাজের বা ক্ষণিকের প্রেরণায় অনেক কিছু কাব্যরূপ লাভ করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই আশানুরূপ কাব্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে না।

বড় কবি মাত্রেরই একটা বৃহত্তর আদর্শ থাকে। একটা বৃহৎ জীবনাদর্শ না থাকলে বড় কবির কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। মনের অনুভূতিকে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সংযুক্ত না করলে সে অনুভূতি গাঢ় হয় না, তাই বৃহৎ আদর্শ না থাকলে কবিতা কালজয়ী হয় না, যেমন সূত্র না হলে বিচ্ছিন্ন পুষ্পরাজিকে মালার রূপ দেওয়া যায় না ঠিক তেমনি কবিতার পেছনে যদি আদর্শ-বাদের সূত্র না থাকে, ব্যাপকতর জীবনাদর্শ না থাকে তাহলে বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলিকে কিসের দ্বারা গ্রথিত করে মহাকালের গলে আমরা পরিয়ে দিতে পারি? সেই যোগসূত্রটা কি? আদর্শের সূত্র, ব্যাপক জীবনবোধই সেই গ্রন্থন শক্তি। এরই ফলে কালজয়ী কবিতা সম্ভব, এ না থাকলে ছিন্ন সৌন্দর্য্য হবে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য সৃষ্টি হবে না, মুহূর্তের অনুভূতির পটভূমিতে বৃহত্তর জীবনবোধ থাকা চাই। খাঁটি কাব্য হচ্ছে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত। আমাদের প্রত্যেক মানুষের পেছনে যেমন আছে নীলাকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পেছনে আছে বৃহত্তর ভাবাকাশ, বৃহত্তর জীবনের আদেশ, মহৎ ও সুউচ্চ জীবন বোধ। খণ্ড কবিতার মধ্যে শাশ্বত জীবন দর্শন থাকে বলেই আমরা তার শাশ্বত রূপের বিচার করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতার মধ্যে সেই বৃহত্তর জীবন বোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের কাব্যরসাস্বাদন কমে যাচ্ছে। কারণ আমাদের বর্তমান জীবন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সব শক্তি জীবনের প্রয়োজন মেটাতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। মনে উদ্বৃত্ত শক্তি থাকছে না যার ফলে কাব্যরসের উপভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের বর্তমান যে জীবন যাত্রা তা বদ্ধ ঘরের জীবন যাত্রার সামিল। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আমরা চলাফেরা করছি। প্রয়োজনের নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি পাই আমরা কবির কাব্য পাঠে। কবিরা বদ্ধ ঘরের গবাক্ষ উদ্ঘাটন করেন যার মধ্যে বাইরের আলো আসে, বাতাস আসে ফলে এর থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। যিনি কবি, যিনি জীবনের শক্তি পরিবেশন করবেন তিনি যদি ঐ প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার সঙ্গে একতান হয়ে যান তবে মুক্তি আসবে না। আমরা সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে একোতন হয়ে গেছি। দুর্বহ জীবনযাত্রা, দুঃসহ ক্লেশ, অসহ্য গ্লানি, ট্রামে বাসে গলদ ঘর্মতা এতে ইন্ধন জোগাবার জন্যে রাজনীতিবিদেরা আছেন। মানবতার চরম অপমান, বদ্ধঘরের জীবনযাত্রার এই যে দুঃখ কষ্ট এখানে যদি কবিরাও এসে যোগ দেন, তাঁরা যদি তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গ্লানিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, বলেন ক্ষুৎ পিপাসা দূর করাই তাঁদের বড় কাজ, তাহলে মানব প্রকৃতির যে সুদূরব্যাপী প্রসার মানবতার যে উদ্বরণ প্রবণতা তা নষ্ট হয়ে যাবে। কবির কাব্যে থাকবে আনন্দের কথা। তিনি শোনাবেন আশার কথা। কবি আমাদের আশা দেবেন যে

আমাদের জন্যে নবোদিত সূর্য্য প্রতীক্ষা করছে। সংগ্রামের বার্ত্তা শোনাবেন কবি, দুঃখ কষ্টের কাছে মাথা নত করেছি এই মনোভাব যদি কাব্য সৃষ্টি করে তাহলে কাব্যের মধ্যে একটা প্রধান আশ্বাসবাণী থেকে বিচ্যুত হই। কাব্যের মধ্যে এই যে দারিদ্র্য, হীনতা, সংগ্রাম তার ওপরে যে জগৎ তার প্রবেশাধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হই। তাই কবিরাও যদি জীবনের প্রয়োজনের দিকটাকেই উর্দ্ধে তুলে ধরেন তবে কবির কাছ থেকে কাব্যের আশ্বাস সান্ত্বনা আমরা পাব না। কবির কাছে আমরা এই আশা করব যে এই বিকৃত জীবন, এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উর্দ্ধে যে জীবন আছে সেই জীবনের বাণী তিনি শোনাবেন। বর্ত্তমানের যে চিত্র আমরা আধুনিক কবিদের রচনার মাধ্যমে দেখতে পাই, যে গ্লানি আমরা লক্ষ্য করি তাই কি সব? কবির কাছে আমরা চাই শাশ্বত আকাশের বাণী। অন্ধকূপের তলা থেকে আকাশের তারা আমরা দেখতে চাই। কবিরা আমাদের সে আশা পূর্ণ করেন কারণ কবির কাছে যা আমরা প্রত্যাশা করি তা আমাদের পূর্ণ হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

আজকের এই সাহিত্যের আসরটি বেশ জমে উঠেছে এবং সাহিত্যের এই তর্কবিতর্ক শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম আজকের এই জমাটি আসরের কাহিনী নিয়ে গল্প লেখা চলে কিনা। কারণ আমি কথা সাহিত্যিক, গল্প লেখাই আমার পেশা।

সাহিত্যের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিফলন দেখতে চাই। এই প্রতিফলন কাব্যের সকল ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও গদ্যে সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কতটুকু সম্ভব। উত্তরে বলা যেতে পারে সবটুকুই সম্ভব। এই ভালো ও মন্দ, কুৎসিত এবং সুন্দর, কল্যাণ এবং অকল্যাণ যাকে কেন্দ্র করে জীবনের এই দ্বন্দ্ব, যার মধ্যে জীবন অগ্রসর হয়ে চলেছে তাকে যদি সত্য বলে প্রতিফলিত করতে পারি তবে জীবনে সত্যিকারের প্রতিফলন আমরা সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাই। সাহিত্য মানুষের সহিত অর্থাৎ জীবনের সহিত চলে। আমাদের এই যে জীবন তা সকালের ঘুম ভাঙ্গা থেকে রাত্রির নিদ্রা পর্য্যন্ত কোন পথে চলে? সে যে পথে চলেছে এবং যে পথে চলে এসেছে সর্ব্বত্রই এক দ্বন্দ্ব। একদিকে তার জীবনটাকে টানছে ভোগ-লালসা, দেহগত প্রবৃত্তি, স্বার্থ, ক্রোধ, হিংসা, মোহ যা তাকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর এক দিকে তার জীবনটা এগিয়ে চলেছে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে। মানুষের ক্ষুধা আদিম কালের। কিন্তু কি সে খাবে? যা খেতে পারা যায় তাই সে খাবে।

আমাদের জীবনের পথে বারবার অন্ধকার এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ অন্ধকার স্থায়ী নয়, কুয়াশা সূর্য্য ঢাকে কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে কুয়াশা স্থায়ী নয়, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আমাকে পীড়া দেয়। এই পীড়া মনে করিয়ে দেয় 'তোমার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি দাওনি'। যে বলছে অপরকে তুমি বঞ্চনা কর, সত্যের আলোকে তুমি যেও না, সে বোধ কদর্য্যতার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, সে বোধ চামড়ার গন্ধে প্রীতি লাভ করে, সে বোধের সঙ্গে মানুষের এক অহরহ দ্বন্দ্ব চলছে। আজকের মানুষের ও অরণ্য জগতের মানুষের যাত্রাপথের যে গতিরেখা আমরা লক্ষ্য করি সে গতিরেখা সর্ব্বদা সরলরেখার মত উর্দ্ধমুখী নয়। কখনও নেমেছে, কখনও উঠেছে, তবু আমাদের যাত্রা আলোকের দিকে। গাছের দুটি দিক। একটি তার মূলের দিক, তা মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হয়ে রস শোষণ করে, অপরটি তার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত সমুন্নত রূপটি। সেই দিকটা সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়ে বর্ণে রসে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করে। জীবনের গতি উর্দ্ধমুখী। তাই তার মনের গতি, মানুষ তার দেহের মধ্যে এ মন পেয়েছে, জীবের দেহে পায়নি। কবি যখন কাব্য রচনা করছে তখন জীবনের এই উর্দ্ধগতিকেই বিশ্লেষণ করছে। পথের মধ্যে গোময় থাকে, কিন্তু ফুল থাকে দরবায়ে, জীবনে কদর্য্যতা আছে, তা যদি ঘৃণা উদ্রেক করে তবে তা স্বাভাবিক, তবে তা সার্থক নয়।

টেরিটি বাজারের চামড়ার ঘ্রাণ আমি যদি না নি তাতে কি ক্ষতি? যে কবি হার মেনেছেন জীবনের অপরিচ্ছন্নতার কাছে তিনি ব্যর্থ।

আধুনিক সাহিত্য, উপন্যাস জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশাকে চরম সত্য বলে মেনে নেয়। তা ঠিক নয়, দুঃখ দুর্দ্দশার কাছে হার মেনেছে যে কবিতা তার মধ্যে যদি বেদনা বোধ থাকে তবে সে কবিতা সার্থক। শুধু দুঃখ দুর্দ্দশার ছবি থাকলেই চলবে না। থাকবে তাকে দূর করার সঙ্কল্প। আবর্জ্জনাকে নিত্য সাফ না করলে তা তার বাস্তব রূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা চিরন্তন রূপ নয়, মানুষের উদ্যম আছে, তার সঙ্কল্প আছে, জীবনে চামড়ার গন্ধই সত্য নয় তাকে এই আবর্জ্জনা দূর করতে হবে। আধুনিক কাব্যের মধ্যে যে প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি তা হল রবীন্দ্র কাব্য থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস। এ প্রয়াসের একটা মূল্য আছে। কল্লোল যুগে আমরা পটলডাঙ্গার পাঁচালী দেখতে পাই। কিন্তু পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যেও সেই সুর আছে। এই পটলডাঙ্গার পাঁচালী পথের পাঁচালীতে এসে পৌঁছেছে, কাব্য আর ডাঙ্গার যুগে নেই, সে এখন নূতন যুগে এসে পৌঁছেছে। নতুন যুগের অগ্রগতি পশ্চাতের খুঁত বার করে নয়, তাকে আত্মসাৎ করে, নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশে তার সার্থকতা, সংকীর্ণতা থেকে উদারতার পথে তার অগ্রগতি, এ দিকেই মানুষের গতি, মনের গতি, সভ্যতার গতি, সাহিত্যের গতি, যদি এ গতি না থাকে তবে তা আমাদের পরাজয়েরই নামান্তর।

জীবনের গতি মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়। ধাবিত হয় বন্ধুর পথে, "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা"। তখনকার ইতিহাস জীবনে সত্য নয়, আলোকের দিকে গতিই সত্য, এটাই ইতিহাস, এটাই স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের রচনাতে যদি এই পতনের কথা না থাকে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। পাঁচ হাজার বৎসরের দীর্ঘ ...নয়কে যে রবীন্দ্র কাব্য প্রদক্ষিণ করেছে সে শাশ্বত কাব্যকে আমরা প্রণাম করি, সেই আদর্শকে সমনে রেখে আমাদের সাহিত্য যাত্রাকে সার্থক বলে মনে করি।

২

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভার সভাপতি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন —

আজ আমাকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্যের আসরে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে তর্ক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, যে আলোচনা সুরু হয়েছে আমি তাতে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছি, আমি এদের দাদাঠাকুর, এদের ওপর তাই আমি মুরুব্বিয়ানা করি। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় আমাকে এখানে আজ তোমরা আহ্বান করেছ, পথের প্রান্তে, জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি এই আমার আনন্দ।

রচনা যদি রসোত্তীর্ণ না হয়, তবে সে সাহিত্য হয় না। আমার ব্যক্তিগত শোকে আমি কাঁদলে তা সাহিত্য হয় না। কিন্তু ইন্দুমতির শোকে অজের যে ক্রন্দন তা সাহিত্য। আমার কান্নার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কান্না যদি প্রতিফলিত হয় তবেই তা সাহিত্য হয়। সংসারের কদর্য্যতা, মালিন্য, ম্লানিমা ত আছেই, সেটাই তার চিরন্তন রূপ নয়। কলকাতার রাস্তায় কুষ্ঠরোগী দেখেছি, কিন্তু এটাই কলকাতার শাশ্বত রূপ এমন ধারণা করলে ভুল হবে।

পরশ পাথর খুঁজছিল ক্ষ্যাপা, অজ্ঞাতে পরশ পাথর সে পেয়েছে, কিন্তু ফেলে দিয়েছে, জানে না কখন কটিদেশের লোহার শিকল সোনার শিকলে পরিণত হয়েছে, যে দিব্যানুভূতি দেশকালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে সেই অনুভূতিই পরশ পাথর, ক্ষণিকের অনুভূতি নিজের মনকে সোনা করে, পরের মনকে সোনা করতে পারে না। সৌন্দর্য্যের যে উপলব্ধি তা এ জন্মেই ঘটে। এ জীবনেই বিশ্বানুভূতি লাভ হয়, এই যে শাশ্বত অনুভূতি এই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি। এই যে দিব্যানুভূতি এ রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

জীবন প্রবাহের যে গতিপথ দেখতে হবে তা কোন গতিপথে পরিচালিত হচ্ছে, হিমালয়ের বুক থেকে যে গাঙ্গেয় ধারা নিঃসৃত হয়েছিল তার স্থান ধূর্জ্জটির জটাজাল।

এই ধারাই ভারতের শ্যামল বুকে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তা বহু যুগ ধরে ভারতকে উর্ব্বর করে তুলেছিল। পাঁচ হাজার বছরের পৃথিবীর সাধনার ধারক ও বাহক রবীন্দ্র নাথের কণ্ঠে পৃথিবীর রূপ ধরা পড়েছে।

প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে হীরক জয়ন্তী উৎসব সমিতির সংগঠন সম্পাদক অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যালের সম্বর্দ্ধনা ভাষণের অনুলিপি—

আজকের এই পুণ্যময় দিনটিতে দীর্ঘ ষাট বৎসর পরে আমরা, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, সম্মিলিত হয়েছি এবং খুব সম্ভবত এই কলেজের এইটেই সর্ব্বপ্রথম প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন। সর্ব্বপ্রথমে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই সম্মেলনকে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সেই মহান নবজাগরণের শেষ মুহূর্ত্তে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের এই কলেজের জন্মলাভ ঘটেছে। আজ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে তখন এই কথা ভেবে আমরা গর্ব্ব অনুভব করতে পারি যে, আমরাও কম প্রাচীন নই; বরঞ্চ আরও গর্ব্ব আমাদের এই ভেবে যে তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলিকাতায় নয়, কোন সরকারী সাহায্যে নয়,—পশ্চিম বাঙলার যোগাযোগহীন সুদূর গ্রামাঞ্চলে সেই উনিশ শতকের শেষ মুহূর্ত্তে বাঙলার এক শিক্ষাবিদ্ জমিদার কুলের দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের পিতামহীর বয়সী এই কলেজটি আমাদের বড়ই আদরের, বড়ই গৌরবের। পশ্চিম বাঙলার শিক্ষা-প্রসার আন্দোলনের ইতিহাসে আমাদের কলেজটির ঐতিহাসিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিনের কথা একবার ভেবে দেখুন।—এদেশের শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে আমাদের বিদেশী সরকার চিরদিনই ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে খৃষ্টান মিশনারী ও শিক্ষাবিদ্‌দের ভূমিকাটুকু বাদ দিলে শিক্ষাপ্রসারের বিষয়ে ইংরেজ সরকারের রাষ্ট্রীয় ভূমিকাটি অত্যন্ত নগণ্য হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষা বলতে ইংরেজ সরকার জনশিক্ষার কথা ভাবতেন না, শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যে সামান্য সংখ্যক কেরাণীর প্রয়োজন তার বেশী শিক্ষাদানের কথা তাঁরা চিরদিনই বাহুল্য মনে করতেন। শুধু তাই নয়, ব্যাপক জনশিক্ষাকে ইংরেজ চিরদিনই ভয় করেছে, পাছে তা' এদেশবাসীর চোখ খুলে দিয়ে নানা বিপদ ডেকে আনে। ১৭৫৭ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যে সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় পাঁচটি কলেজও গঠিত হয় নি। পূর্ব্বেই বলেছি হেয়ার-ডিরোজিয়ো-কেরী-মার্শম্যান প্রমুখ বিদেশী শিক্ষাবিদদের সাথে বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তিকে এক করে দেখলে চলবে না। রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধামোহন প্রমুখ বাঙলার প্রাতঃস্মরণীয় নেতারা এবং বিদেশী শিক্ষাবিদ্‌রা এদেশের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাপ্রসারী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ইংরাজ সরকার এ বিষয়ে কোনদিনই আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হন নি। তখনকার দিনে সমস্ত বিষয়টিই ছিল আবেদন নিবেদনের ব্যাপার—অধিকারের প্রশ্ন নয়। ইংরাজের করুণা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এদেশে যে শিক্ষাবিস্তার সম্ভবপর নয়, একথা বাঙলার রেনাসাঁর হোতারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় সারা দেশময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী হলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা বাঙলার জমিদার কুলের একটি ব্যাপক অংশ এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। বিদেশী ইংরাজ সরকারের আনুকূল্যে এদেশে যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠেছে তার চাইতে অনেক বেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশের শিক্ষাবিদ্ জমিদার শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে গড়ে উঠেছে। প্রায় অধিকাংশ বড় বড় জমিদাররাই নিজ নিজ এলাকায় একটি করে উচ্চ ইংরেজী স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। নিদেন একটি মাইনর কিংবা "মডেল স্কুল" ও গড়ে তুলেছিলেন। সে তুলনায় জেলার কেন্দ্রে একটি করে কলেজ তো দূরের কথা,—একটি জেলা-স্কুল ও বাংলা-স্কুল ছাড়া তার অন্য কোন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বাঙলার অধিকাংশ কলেজগুলি এই শিক্ষাব্রতী জমিদার শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে গড়ে উঠেছে—একথা কেমন করে অস্বীকার করবো? বর্দ্ধমান কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, বহরমপুর কলেজ, কুচবিহার কলেজ, রংপুর কলেজ,

পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কলেজই আর আমাদের এই কৃষ্ণচন্দ্র কলেজও এইসব শিক্ষানুরাগী জমিদার শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে গড়ে উঠেছে। বাঙলার রেনাসাঁ-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কার্য্যকলাপ হুগলী ও কলিকাতা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পশ্চিম বাঙলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে জনশিক্ষা প্রসারে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের যে বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে তার তাৎপর্য্য অত্যন্ত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ।

সেদিনে বীরভূম জেলায় কলেজী-শিক্ষা প্রসার কল্পে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ভূমিকাটীর কথা একবার স্মরণ করি। শিক্ষা, বিশেষ করে কলেজী শিক্ষা, সেদিন ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ,—অন্তত মফস্বলের গরীব মধ্যবিত্ত সন্তানদের পক্ষে। স্বল্প-আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত ভাববিলাস বলে মনে হত। কোনরকমে এন্ট্রান্স পাশ করে একটা ত্রিশটাকা মাইনের সরকারী চাকুরী পাওয়া সেকালে ইন্দ্রত্ব পাওয়ার মতই কাম্য ছিল। কিন্তু এন্ট্রান্স পাশ করাটাও আমাদের জেলাবাসীর পক্ষে দুরূহ ছিল। কেননা জেলাতে তখন উচ্চ ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ১৮৫১ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র বীরভূম জেলায় মাত্র চারটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল ছিল,—তার মধ্যে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের হেতমপুর রাজ উচ্চ ইংরেজী স্কুল একটি। কলেজ বলতে তখন কেবল হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ এবং এই এলাকার মধ্যে বহরমপুর ও বর্দ্ধমান কলেজ। বিশ্বভারতী কলেজ সুরু হয় ১৯২৬ খৃঃ। কিন্তু বিশ্বভারতী কলেজে পড়াশুনা সেদিনের তুলনায় অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং এই অঞ্চলে একমাত্র হেতমপুর কলেজই সাধারণ মানুষের কলেজী শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে। হেতমপুর কলেজের প্রধান ঐতিহ্য হচ্ছে, কলেজের সুরু থেকেই অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে সাধারণ গরীব মানুষকে কলেজী শিক্ষা দিয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত কলেজ থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে পড়াশুনো হয়ে আসছে আমাদের কলেজে। আমাদের মত গরীব দেশে এর তাৎপর্য্য কত বেশী আজ আমরা তা' বুঝতে পারি। শুধু যে বীরভূম জেলার লোকদের মধ্যেই হেতমপুর কলেজের শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। তৎকালে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা, সমগ্র মালদহ জেলা, সমগ্র মানভূম জেলা, আসানসোল কালনা-কাটোয়া মহকুমার কোন কলেজে ছিল না এবং এখানকার বহু ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে, অধ্যয়ন করতে আসতেন। স্বল্পব্যয়ে সহরাঞ্চলের বাষ্পমুক্ত কলেজী শিক্ষা লাভের তখন একমাত্র কেন্দ্র ছিল আমাদের এই কলেজ।

আজকের দিনে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের তাৎপর্য্য শুধুমাত্র প্রাক্তন ছাত্রদের এক প্রীতিসম্মেলনই নয়। বাঙলার নবজাগরণের মহান্ শিক্ষাবিদদের সেই মহান্ ঐতিহ্যকে আমাদের এই গরীব দেশে সফল করে তোলার কাজে ব্রতী হতে হবে। দেশ আজ স্বাধীন। দেশকে সুপরিকল্পিতরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব আজ আমাদের। আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী গরীব। দেশের শিক্ষার মান অনেক নীচু এবং তার সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা। দেশের সর্ব্বস্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রসারিত করা এবং তা স্বল্পব্যয়ে সাধারণ গরীব মানুষের আয়ত্বের মধ্যে আনয়ন করা—এই দুইটিই আজ আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা। এই জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে জাতীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিকী [illegible] অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ছাড়াও আমাদের এই শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এই সম্মেলনে প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সৃষ্টিশীল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। আমরা যারা এই কলেজে শিক্ষালাভ করেছি, আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠাত্রীর সেই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, দেশের সাধারণ মানুষকে উচ্চশিক্ষিত করবার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। দেশে আরও বহু নূতন নূতন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু তার পূর্ব্বে যে সব পুরাতন কলেজ আছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত ও বলিষ্ঠ করে তুলবার দায়িত্ব আজ আপনাদের উপরেই ; —বিশেষ করে আমরা যারা এই কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেছি, এই কলেজটিকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করে তোলার জন্য আমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তা না পালন করলে স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে বলে মনে করি।

রোজনামচার কয়েক-পাতা

শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক
সাহিত্য শাখা, ছাত্র-ইউনিয়ন

১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি, ২টা

—অসহ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে শরীর, স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীব্র অবসাদের বোঝা। কিন্তু না, তবুও আমাকে লিখে যেতে হবে, লিখতেই হবে। এতো শুধু আমার রোজনামচাই নয়—এ যে ইতিহাস, ইতিহাসেরই কটা পাতা। হয়ত তথ্যভারাক্রান্ত কোন ইতিহাসের বুকে কোনদিন এর ঠাঁই হবে না, তবু আমার রোজনামচার পাতায় আজ আমি ইতিহাস রচনা করতে বসেছি।" ইতিহাসে রাজা-বাদসার কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়, "কিন্তু দুটো দিনের এই ছোট্ট কাহিনীর টুকরো দুর্লভ পুঁথির মতো লুকানো রইল আমার এই রোজনামচার পাতায়।

পূব আকাশে শুকতারাটা তখনও বোধহয় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। চোখের পাতা থেকে তখনও মুছে যায় নি ঘুমের স্বপ্নিল পরশ, শিথিল অঙ্গে তখনও তন্দ্রার জড়িমা। হঠাৎ একটা সুরের মূর্চ্ছনায় ভ'রে উঠল প্রত্যুষের আকাশ বাতাস। পাখীদের কাকলি তখনও শোনা যায় নি ডালে ডালে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম; কিন্তু পরক্ষণেই আবার গড়িয়ে পড়লুম পরম শ্রান্তিতে। কাক-না-ডাকা সেই ভোর আর নহবতের মিষ্টি আলাপন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য দেহমন দুইই উন্মুখ হয়েছিল। কিন্তু "সময় নাহি যে হায়" তাই মনের ইচ্ছে মনে চেপেই উঠতে হোলো।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই দিনটির জন্যই প্রতীক্ষমান। নহবতের সুর কানে কানে এসে ব'লে গেল "ওঠো, জাগো, এতদিন ধরে যে লগ্নের প্রতীক্ষা করছিলে আমি এনেছি তাকে আহ্বান ক'রে; তোমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাও, বরণ করে নাও।"

হাত-মুখে একটু জল ছিটিয়েই ছুটলুম মণ্ডপের দিকে। কলেজের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিশেষ ভাবে নির্মিত মণ্ডপ—মধ্যে সুসজ্জিত অনুষ্ঠানমঞ্চ। সবুজ-পাতায়-ছাওয়া তোরণের দুপাশে অলংকৃত জলপূর্ণ মঙ্গল কলস, শিশু-কদলী বৃক্ষ। গ্রাম বাংলার মাটি ঘেঁষা মানুষের কুটিরের পুণ্য-উৎসবের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল মণ্ডপের ঐ সজ্জিত অথচ অনাড়ম্বর পরিবেশ। নহবত তখন ডাক পাঠিয়েছে চেনা-অচেনা, জানা-অজানা অতিথি অভ্যাগতদের কাছে—

"আজি দখিন দুয়ার খোলা
এস হে, এস হে, এস হে"

৮টায় পতাকা উত্তোলন—৯টায় সুরু হীরক-জয়ন্তী উৎসব। তোড়জোড় চলছিল অনেক দিন থেকে, চলেছে কালও মাঝ রাত্তির অবধি। সকাল বেলাতেও মঞ্চ আর মণ্ডপ শিল্পীকে একবার ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল মণ্ডপের চারিদিকে, বোধহয় সব কিছুর ওপর একবার final touch দেবার জন্য।

মণ্ডপ ধীরে ধীরে ভরে উঠছিল ছাত্র-অধ্যাপক, স্বেচ্ছাসেবক, অথিতি-অভ্যাগতে। সময় হোল পতাকা উত্তোলনের। অধ্যক্ষ মহাশয় ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে গেলেন পতাকা-বেদীর দিকে। বেদীর চারপাশে ধান আর পিটুলি গোলার দর্শনীয় আলপনা—ছাত্রীদের শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর সগৌরবে বহন করছিল। কলেজের স্মারক-চিহ্ন লাঞ্ছিত 'নাবিক-নীল' রঙের পতাকা উড়ল আকাশের বুকে, ঝরে পড়ল পুষ্প সম্ভার, সামরিক ব্যাণ্ডে বেজে উঠল জাতীয়-সঙ্গীতের সুর। জয়ধ্বনি করে পতাকা অভিবাদন করলেন ছাত্র-অধ্যাপকের দল। ক্লিক্ ক'রে আওয়াজ হোল, ঝলসে উঠল ক্যামেরার বাল্ব। মনে মনে বললুম "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"

৯টায় উৎসব সুরু হবার কথা। মণ্ডপ ইতিমধ্যেই ভ'রে উঠেছিল দর্শক-শ্রোতায়। মাননীয় অতিথিরাও একে একে আসন গ্রহণ করলেন অনুষ্ঠান মঞ্চে। সর্ব প্রথম মঞ্চে এলেন বাংলার সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মশায়। তাঁরই সমভিব্যাহারে এলেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধুনাখ্যাত ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার। তারপরই মঞ্চে দেখলুম সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চরম ঔৎসুক্য নিয়ে এঁরই দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করছিলুম আমরা এবং আরো অনেকেই। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন এলেন ৯টার কয়েক মিনিট পরে তাই অনুষ্ঠান সুরু হ'তেও বিলম্ব হোল কয়েক মিনিট। অনুষ্ঠান চলারই কোন ফাঁকে এসে গিয়েছিলেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তা লক্ষ্যই করি নি।

সৌম্যকান্তি ডাঃ সেন আসন গ্রহণ করতেই সুরু হোল অনুষ্ঠানের কর্মসূচী। 'শুভ কর্ম পথে'র 'নির্ভয় গান, দিয়ে যাত্রা সুরু হোল উৎসবের। অধ্যাপক তনয়া ছোট্ট কৃষ্ণা মালাচন্দন দিয়ে বরণ কোরল সভাপতি আর উদ্বোধককে; করতালিতে ভ'রে উঠল মণ্ডপ। সুললিত কণ্ঠে স্বস্তিবাচন করলেন অধ্যাপক গিরিধারী গুপ্ত। এরপরই ছিল দীপ-প্রজ্জ্বলন। শুভ-অনুষ্ঠানে দীপ-প্রজ্জ্বলনের প্রথা প্রাচীন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এদিকে কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেন উদ্বোধক, আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পশ্চাতে ৬১টি আলোকবিন্দুতে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল একটি নাম "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ"। এক ষষ্ঠি বর্ষীয়া বৃদ্ধার উজ্জ্বল ভাষা। 'হীরক-জয়ন্তী সমিতির' সভাপতির অভিভাষণের পর অধ্যক্ষ মহাশয় বর্ণনা করলেন মহাবিদ্যালয়ের এই দীর্ঘ একষট্টি বছরের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। তার চলার পথের এই পাঁচালী শুনতে শুনতে মন ভরে উঠেছিল আনন্দ আর বেদনায়।

উদ্বোধক ডাঃ সেন তার ভাষণে বললেন "আমরা জন্মগ্রহণ করি দায় নিয়ে,—ঋণ নিয়ে। মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, গুরুঋণ, দেবঋণ,—এমনি আরো কত শত ঋণ। এই ঋণ পরিশোধ করার মধ্যেই আমাদের জন্ম ও বেঁচে থাকার সার্থকতা।

আজ আমাদের ঋণের বোঝা বেড়েছে। আজ আমাদের নবতম দায় দেশের ঋণ পরিশোধ।

তাই আজ এই উৎসবে সংকল্প নিতে হবে,—এই বিদ্যালয়ের ঋণ শোধ কোরব, দেশকে গড়ে তুলব সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে।"

সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ক'রে বললেন "পদ্মসুন্দরী যদি সোনার কলস শোভিত মন্দির তৈরী করতেন, তাতে আশ্চর্য্য হতাম না। যদি তিনি কোন পুণ্য তীর্থে নদীর ঘাট বাঁধিয়ে দিতেন, এমন কি দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য আতুরাশ্রম তৈরি করে দিতেন, তাহ'লে ভাল লাগত, কিন্তু অভিভূত হতাম না। এমন তো কত পূণ্যশীলা রমণী দান করেছেন, কত অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু তখনকার দিনে এই নিভৃত পল্লী অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে চেষ্টা তিনি করেছেন তাকে স্মরণ করে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। তিনি নিজের জীবনে যা অনুভব করেছিলেন তাই তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তার জন্য মহারাণী পদ্মসুন্দরীকে আমি বার বার নমস্কার জানাচ্ছি।"

আমাদের জাতীয়-জীবনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তারাশঙ্করবাবু বললেন—"আজ আমাদের জাতীয়-জীবনের রথ টানতে হবে। ওই বিশাল জগন্নাথের রথ টানতে হবে। সেই হচ্ছে কর্ত্তব্য। সততার সাথে দেশকে অনুভব ক'রে কল্যাণের পথে সেই রথ টেনে নিয়ে যেতে হবে। তখনই আমরা অন্ন পাবো, বস্ত্র পাবো, স্বাস্থ্য পাবো—সব পাবো। নতুন কাল চলছে, তার সাথেই চলতে হবে।"

উপসংহারে তিনি বললেন,—"আপনাদের ওপর অনেক ভরসা। তারুণ্যের মধ্যেই জাতীয়-জীবন সার্থক হয়। যে ভবিষ্যৎ চেয়েছিলাম সেই ভবিষ্যৎ এসেছে। তাকে আমাদের উপযোগী ক'রে নিতে হবে। চলার সময় দ্রুত

গতিতে চলা দরকার। কিন্তু সেই দ্রুততার সঙ্গে যেন সংযম থাকে, আমরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে না পড়ি যেন। মাথার উপর ঈশ্বর রয়েছেন, হৃদয়ে সংকল্পের দৃঢ়তা আর যার ওপর জগন্নাথের রথ চলছে সেই আমার দেশের মাটি মা। এ বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে তবেই আমরা সার্থক হবো।"

সাহিত্যিক তারাশঙ্করকে জানতুম কিন্তু বক্তা তারাশঙ্করকে আজই মাত্র চিনলুম। সর্ব্বশেষ সমবেত অতিথি ও শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন কলেজ পরিচালক সমিতির সভাপতি ভারনন শিবচন্দ্র বোনার্জী।

এরপর মঞ্চত্যাগ ক'রে সভাপতি এগিয়ে গেলেন। সেখানে আবৃত ছিল বিরাট এক প্রতিকৃতি। সভাপতি আবরণ উন্মোচন করলেন—দর্শকদের সামনে প্রতিভাত হোল দীপ্তিময়ী এক মাতৃমূর্তি—মহাবিদ্যালয়ের স্নেহময়ী জননী পুণ্যশ্লোকা মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী। চারিদিকে একটা অটুট গাম্ভীর্য্য—একটা ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। অদ্ভুত লাগল সেই মুহূর্তটা।

'হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা
হে বন্ধু আমার
সে পুণ্যতীর্থের যিনি জাগ্রত দেবতা
তাঁরে নমস্কার।'

মঞ্চের অনুষ্ঠান এই খানেই শেষ। উদ্বোধক সমভি-ব্যবহারে মাননীয় অতিথিরা নেমে এলেন মঞ্চ থেকে, চললেন বিজ্ঞান-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও নব বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে। সারবন্দি হয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা পথ ক'রে দিল—ওঁরা গেলেন এগিয়ে। কলেজের দক্ষিণ প্রান্তে নব-নির্ম্মিত বিজ্ঞান-ভবন শুভ্র হাস্যে আকুল আগ্রহে আহ্বান জানাল তাদের। দ্বারোদ্ঘাটনের পর এরই বাম পার্শ্বে নব-বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন শ্রী সেন। সামরিক ব্যাণ্ড আবার বেজে উঠল, আবার ঝলসে উঠল অনঙ্গ বাবুর ক্যামেরা। এরই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

কিন্তু সবে ত সুরু, সারার এখনো অনেক দেরী। তাই চাটি নাকে-মুখে গুঁজে আবার তখনি ছুটলুম রঞ্জন গ্রাউণ্ডের দিকে। একটা থেকে সেখানে সুরু হবার কথা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। লোকে লোকারণ্য মাঠ—ভ'রে উঠেছে প্রতিযোগী আর দর্শকে। মাথার ওপর বাসন্তী সূর্য্যের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ। কদিন আগে হঠাৎ মেঘ আর বৃষ্টি দেখে মনটা বেশ দমে গিয়েছিল, মনে করেছিলুম বুঝি মাটি হয় সব উদ্যোগ-আয়োজন। কিন্তু আজকের এই দুপুরটায় মনে হোল সেই মেঘের ছিটে ফোটা অবশিষ্ট থাকলে বোধহয় সূর্য্যদেব প্রাণ ভ'রে এমন আশীর্ব্বাদ করতে পারতেন না। প্যাভিলিয়ন একটা খাড়া করা হয়েছিল কিন্তু তাতে তামাম মাঠের লোকের মাথা বাঁচানর চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

হঠাৎ কি মনে ক'রে এগিয়ে গেলুম মাঠের পূর্বদিকে, যেখানে বট-অশ্বত্থের ছায়া-ঘেরা একমুঠো সবুজ জায়গা—ছোট্ট একটি শান্তিময় সমাধি—বাদশা দুহিতা আমিনার। বসলুম ওখানে। সুবোধ ঘোষ মশায় লিখেছিলেন নিভৃত, নির্জন দুপুরে এই ধূ ধূ করা প্রান্তরের মাঝে সমাধিপাশের কোন এক বৃক্ষশাখায় আজও শোনা যায় 'একটি বুলবুলির শিষ।' বিরহিণী প্রিয়ার মন-দোলান আহ্বান। কান খাড়া ক'রে রইলুম যদি সত্যি হয় কিংবদন্তী। হা হতোস্মি কোথায় বুলবুলি একটা চড়ায়ের কিচির মিচিরও শুনলুম না। শুধু মাইকের একটানা গগনবিদারী আওয়াজ ভেসে আসছিল "440 metres run competitors get ready" বিরক্ত হয়েই আবার গেলুম মাঠের দিকে। মনে হোল বুলবুলিটার আর কিছু থাক আর না থাক রসবোধ আছে। আজকের দিনের এখানকার পরিবেশটা যে নিভৃত প্রেমালাপের পক্ষে প্রশস্ত হবে না সেটা বুঝেই বোধহয় উড়ে গ্যাছে কোন অচেনা প্রান্তরের দিকে।

প্রতিযোগিতার বেশীর ভাগগুলোই ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গ্যাছে কয়েক দিন আগে। কয়েকটা Eventই মাত্র বাকী ছিল। এক এক করে সব কটাই হয়ে গেল। প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের দড়ি টানাটানি অনুষ্ঠানটা সকলেই প্রাণ ভ'রে উপভোগ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু নবীনদের সজীব শক্তির কাছে হটে গ্যালেন প্রাচীনরা। অধ্যাপকদের ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তিতে দেখা গ্যাল অধ্যক্ষ মশাইকে পুরোভাগে। মেয়েরা মাথার কলসীর ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত

নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। মিউজিক্যাল চেয়ারও নিসন্দেহে সেদিনকার উপভোগ্য অনুষ্ঠান, বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে এই প্রথম সেদিন রঞ্জন-গ্রাউণ্ডে মেয়েদের প্রকাশ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেখা গ্যাল যেটা বোধহয় মাত্র দু-একবছর আগেও একটি অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা ছিল এই হেতমপুরে এবং তার জনসাধারণের কাছে। এবং আরো আশ্চর্য্য যে সকলেই এটা উপভোগ করলেন বিন্দুমাত্র মুখবিকৃতি না করেই। কবির আক্ষেপ "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"—আর বেশীদিন ধোপে টিকবে না বোধ হয়। হেতমপুরের মাঠে সেদিন নতুন ক'রে হেতমপুরের ইতিহাস রচনা সুরু হোল যেমন কলেজে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তনে।

Sports এর ক্ষেত্রে খুব বড় রকম একটা কৃতিত্ব আশা করা যায় নি। যে কলেজে একযুগ অন্তর একবার sports হয় সেখানে প্রতিযোগী মেলাই দুষ্কর, রেকর্ডের প্রশ্ন ত অবান্তর। তাই কলেজের sports হয়েও কলেজ রেকর্ডের ধার ঘেঁসেও কোন প্রতিযোগীর কৃতিত্ব পৌঁছুতে পারল না। এর জন্য [illegible]। [illegible] [illegible] শেষ হোল, [illegible] Go as you [illegible]

ছুটতে ছুটতে এলুম আবার কলেজের দিকে। একটা মিনিটও দম ফেলবার উপায় নেই। প্রোগ্রামের ঠাসবুনানি একেবারে। বিকেল ৪ টেয় সুরু হবার কথা প্রাক্তন-ছাত্র সম্মেলন। আমি কিন্তু ভেবে রেখেছিলুন ৫টার একমিনিট এদিকে অনুষ্ঠান সুরু করা সম্ভব হবে না তা জগদীশবাবু যতই লাফালাফি করুন না কেন; তিনিও বাঙ্গালী আর যাঁরা আসবেন তাঁরাও ঐ দলের দলী। সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলুম কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হোল না। বেশ কিছুটা দূর থেকেই শুনতে পেলুম মাইকে ভেসে আসছে "আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত, আমরা নতুন যৌবনের দূত।" প্রাক্তনদের যৌবন চাঞ্চল্য দেখে মনে হোল—হেরে গেছি। বাঙ্গালীর থাক আর না থাক "প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলনের" উদ্যোক্তাদের প্রখর punctuality সম্পর্কে দ্বিমত হবার অবকাশ ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল কলেজের সাধারণ ছাত্র-সভার কথা। ৩-১৫ টায় সময় নির্ধারিত হলে পৌনে চারটের আগে কারুর টিকি দেখা যায় না, দুশো ছেলের জায়গায় উপস্থিত হন সাকুল্যে ৭৫টি। প্রাক্তনরা এদিকে আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়েছেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলুম ভরা-মণ্ডপে। সকালের চেয়ে জনসমাগমটা কিছু অধিক বলেই মনে হোল। প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের পৌরোহিত্য ভার গ্রহণ করেছিলেন কলেজের কৃতি প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ শ্রীকুমারই যে আমাদেরই পূর্বসূরী এটা সত্যিই আমাদের গর্ব আর সৌভাগ্যের বিষয়। কলেজ সম্পর্কে খুব বেশী কিছু বলে উঠতে পারি না ক্যালকেশিয়ান বন্ধুদের কাছে তখন এটুকু বলতে সান্ত্বনা পাই "আরে জানিস্ ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন। বেশী মস্তানি করতে আসিস্ নি।"

প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার।

যাঁরা আমাদেরই মত একদিন এসেছিলেন এই মহাবিদ্যালয়ের সংস্পর্শে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দর দিনগুলো কাটিয়েছেন এরই চন্দ্রাতপতলে, এরই প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যাঁদের [illegible] আমরা আজও পাই [illegible] সৌভাগ্য আমাদের অন্তর পূর্ণ করে দিল। প্রাক্তনরাও তাঁদের ফেলে-আসা নানান-রঙের দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন ক'রে আরো মধুর, আরো সুন্দর, আরো পূর্ণাঙ্গ, আরো সার্থক ক'রে তুললেন আজকের এই গোধূলি লগ্ন। মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে এই একটি বিকালের স্মৃতি।

প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যাল। বাংলার রেনেসাঁর যুগে সামন্ত শ্রেণীর অবদানের কথা তিনি বর্ণনা করলেন এবং সেইযুগে স্থানীয় জমিদারদের উৎসাহে এবং আনুকূল্যেই যে আজ থেকে ৬১ বছর আগে এ মহাবিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এ কথা স্বীকার করে তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁদের। এরপরই ভাষণ দিলেন প্রধান-অতিথি ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার। তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে পুরানো দিনের অনেক কথাই শুনলুম, জানলুম, তখনকার দিনে ছাত্র-

অধ্যাপকদের সম্পর্কটা কত মধুর, কত সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল তার বর্ণনা দিলেন অতিসুন্দর ভাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এ গর্বটুকু আজও আমাদের অটুট আছে। ছাত্রদের চরিত্রগঠন প্রসঙ্গে ডাঃ মজুমদার বললেন ছাত্রদের চরিত্র সুগঠিত করার দায়িত্ব শুধু অধ্যাপকদেরই নয়, এ দায়িত্বভারটা অভিভাবকদেরও সমভাবে বলে করা উচিত। অধ্যাপকদের সান্নিধ্য ছাত্ররা অভিভাবকদের তুলনায় অনেক কম পেয়ে থাকে। তাই অধ্যাপক অপেক্ষা অভিভাবকদের প্রভাবটাই ছাত্রদের বেশী উদ্বুদ্ধ করে, সেজন্য তাঁদের সচেতন হয়ে ছাত্রদের পথ দেখান উচিত।

ডাঃ মজুমদারের পর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। কিন্তু প্রধান অতিথি মহাশয়ের ছিল ট্রেণ ধরার তাড়া। এক একজন প্রাক্তন ছাত্রের ভাষণ শেষ হয় আর প্রধান অতিথি মশায় একটু ক'রে নড়ে চড়ে ওঠেন। অথচ সভাপতির ভাষণটা না শুনেও উঠতে পাচ্ছিলেন না। এদিকে ঘড়ির কাঁটাও এগোচ্ছিল। অবশেষে তাঁর অনুরোধে প্রোগ্রাম কিছুটা কাট-ছাঁট করে শেষ পর্য্যন্ত উঠতে হোল সভাপতি মহাশয়কে। বর্ষীয়ান প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ ব্যানার্জী প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে তাঁর সুচিন্তিত চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর এই সুদীর্ঘ ভাষণের মধ্যে একটা জিনিষ, অদ্ভুতই বলতে হবে রীতিমত, লক্ষ্য করলুন। ডাঃ ব্যানার্জীর ইংরাজী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তির কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি তাঁর এই ৯০ মিনিটের ভাষণের মধ্যে কুল্যে একটি ইংরাজী শব্দও ব্যবহার করেন নি।

ছাত্রদের চরিত্রগঠন সম্পর্কে ডাঃ মজুমদারের মতের বিরোধিতা ক'রে ডাঃ ব্যানার্জী বললেন ছাত্রদের চরিত্র গঠনে অধ্যাপকদের প্রভাব সমধিক। স্বল্পকালীন সান্নিধ্য-সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছাত্র-মনের উপর যতখানি গভীর দাগ কাটে তা সর্বক্ষেত্রে অভিভাবকদের দ্বারা সম্ভব নয়। ছাত্রের অভিভাবকদের মানসিক গঠন ও পারিবারিক পরিবেশ যদি চরিত্র গঠনের অনুকূল না হয় তবে সে প্রভাব ছাত্র জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। সহৃদয় মনোবৃত্তি ব্যক্তিত্ব দিয়ে ছাত্র-জীবনকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার দায়িত্ব অধ্যাপকদেরই। এ বিষয়ে তাঁদের সচেতন হ'তে হবে।

মুগ্ধ হয়ে শুনলুম তাঁর অভিভাষণ। কোথা দিয়ে কেটে গেল দেড়টা ঘণ্টা বুঝতেই পারলুম না। ভাষণ শেষ হ'লে মনে মনে বললুম—

শুধু তোমার বাণী নয়গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

কোলকাতার মাঠে যাঁরা এভার্টন উইক্‌সের ব্যাটিং দেখেছেন বা কোন সঙ্গীত সম্মেলনে যাঁরা রবিশঙ্করের সেতার শুনেছেন তাঁরা জানেন যে এঁদের পরে উইকেটে এসে ব্যাটিংএর মার প্যাঁচ দেখান বা সুরের ইন্দ্রজাল বুনে শ্রোতার চিত্তজয় করার ল্যাঠা কতখানি। ঠিক এই অবস্থাই হোল 'প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে' ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের পর। আরো কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র অপেক্ষা করছিলেন সভাপতির পর কিছু বলবেন ব'লে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা খুব বেশী effect সৃষ্টি ক'রে উঠতে পারলেন না।

সভা প্রায় শেষ হবো হবো—অকস্মাৎ অঘটনটা ঘটে গ্যাল। মহিলাদের সংরক্ষিত আসন থেকে এক ভদ্রমহিলা উঠে হাজির হলেন একেবারে অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে। বলি ব্যাপার কি। এঁর উদ্দেশ্যটা কি? সেই মুহূর্তেই দেখি এক উন্মাদ যুবক হাতে এক পিস্তল নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে—চঞ্চল হ'য়ে উঠল স্বেচ্ছাসেবকরা, কিন্তু বাধাদেবার আগেই উন্মাদ হাসি হেসে যুবক হাজির হোল একেবারে মহিলাটির পেছনে। রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি কি হয় দেখার জন্যে। কিন্তু আসল মামলাটা তখনও ছিল বাকী। কোথা থেকে এসে উপস্থিত এক কুষ্ঠরোগী ভিখিরি, এক খঞ্জ, খোনা ভিখিরি। মহা হৈ হট্টগোল। এ ত দেখি বোম্ বখেড়া হোল। এসব অবাঞ্ছিত লোকেরা আসরে এল কি ক'রে, স্বেচ্ছাসেবকরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে? G. O. C-র কাছে যাব কি না ভাবছি, দেখি কোথাকার এক মেঠো চাষা জল নেই, বৃষ্টি নেই এক তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে ভাবলেশ হীন মুখে এগোচ্ছে মঞ্চের দিকে।

আরে এটা কি মগের মুল্লুক হ'য়ে উঠল নাকি—যে

হচ্ছে, যার ইচ্ছে এগোচ্ছে মঞ্চের দিকে, ভাবদেন কি অতিথিরা। 'এই এখানে কি চাই?'—ধমক দিতে গেলুম হুঁকোধারীকে। সে আমার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে দিল একটু। নে বাবা—এটাও ক্ষ্যাপা না কি একটা? যত নষ্টের গোড়া ঐ মহিলাটি? আবার হতভম্ব হ'য়ে কোনদিকে যাব ভাবছিলুম। ঠিক এই সময় মাইকে শুনতে পেলুম অধ্যাপক সত্যেন মুখার্জীর গলা—"Competitors of 'Go As You Like,—disperse."

সে হালুয়া—একেবারে বেহদ্দ বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিল। মোদ্দা কথাটা হোল এর আগের ঘোষণাটা আমি শুনতেই পাই নি, তা হ'লে এতটা বেকুবি করতুম না বোধ হয়।

প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মেলনের শেষে ছিল স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরণের পালা। ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী পুরস্কার বিতরণ করলেন।

সম্মেলন যখন শেষ হোল, সন্ধ্যে তার অনেক আগেই উৎরে গ্যাছে। এর পরই ছিল আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান—সঙ্গীতের আসর। এদিক থেকে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। আজকের আসরে আমরা পেয়েছিলুম স্বনামখ্যাত শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও সম্প্রদায়কে। সম্প্রদায়ে ছিলেন সর্বশ্রী বিশ্বজিৎ রায়, সুনন্দা রায়, উষা সেনগুপ্তা ও সঞ্জয় সেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শান্তিবাবুর অবদানের এত প্রাচুর্য্য এতখানি যে তাঁর সম্পর্কে নতুন ক'রে কিছু বলে পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা বাতুলতা। তাঁর গভীর শিল্প-বোধ ও শিল্পমানসের পরিচিতি অন্ততঃ বাংলার সঙ্গীত-রসিকদের অজানা নয়। শান্তিদেব ঘোষ জাত-শিল্পী।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে বিশ্বজিৎ রায়ও সুপরিচিত এবং খ্যাতিমান শিল্পী। আর একটি প্রতিশ্রুতি-ভরা শিল্পীকে আমরা পেলুম আসরে, তিনি হলেন সুনন্দা রায়। বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে এই তরুণী শিল্পীর মধ্যে। তাঁর নিজস্ব একটা বলিষ্ঠ গায়ন-ভঙ্গী আছে যার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। রবীন্দ্র সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষার দিকেও তিনি পুরোমাত্রায় সচেতন যার অভাব অধুনা অনেক উঠতি-শিল্পীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। শিল্পী হিসেবে অনেকখানি আশা রাখি এঁর কাছে এবং কামনা করি এঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

শুনেছিলুম শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই দুই শিল্পীকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমেদাবাদে—'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'। এই ছোট্টদলটি মাতিয়ে দিয়ে এসেছিল সারা আমেদাবাদকে এবং গুজরাতি জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে তাঁদের যোগ দিতে হয়েছিল একাধিক অনুষ্ঠানে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই দলটিকে আমরা পেয়েছিলুম আমাদের মাঝে। আর উপরি হিসেবে পেয়েছিলুম শ্রীমতী উষা সেনগুপ্তাকে। যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্যা তিনি। তিনিও আমাদের হতাশ করেন নি। এঁদের প্রত্যেকটী একক, দ্বৈত এবং সমবেত সঙ্গীত সুগীত। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম কখন শুনব শান্তিবাবুর গান। অবশেষে সব প্রতীক্ষার অবসান হোল। এস্রাজ ছেড়ে শ্রীঘোষ এগিয়ে এলেন মাইকের সামনে। দুখানি সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে তিনি ধরলেন তাঁর সেই মন-মাতান, পাগল করা গান "কৃষ্ণ কলি"। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম শিল্পীর দিকে।

—"সুরের আলো ফেলে ভুবন ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধনী।"

এই মুহূর্তে চোখ বুজে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করছিলুম সেই সুরের অনুরণন—

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি আর যা বলে বলুক
অন্যলোক।
দেখেছিলেম ময়না পাড়ার মাঠে কালো মেয়ের
কালো হরিণ চোখ॥
মাথার প'রে দেয়নি তুলে বাস, লজ্জা পাবার
পায়নি অবকাশ,
কালো? তা সে যতই কালো হোক দেখেছি তার
কালো হরিণ চোখ॥"

মনে পড়ছে না কখন গান থেমে গিয়েছিল কিন্তু চমক ভাঙতে মনে হোল একবার চীৎকার ক'রে বলি—

"আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥
তুমি কেমন ক'রে গান করহে গুনি
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুণি।"

কিন্তু আর একটা বড় বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছিল। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলুম শান্তিদেবের পেছনে গেরুয়া রঙের শার্ট পরা এক ভদ্রলোক হারমোনিয়ামের রিড টিপে বসেছিলেন প্রত্যেকের গানের সঙ্গে। ভেবেছিলুম সানায়ের পোঁ ধরা গোছের কেউ বটেন। নামী শিল্পীদের সঙ্গে ওরকম আলতু-ফালতু দু একজন এসেই থাকেন, সুতরাং তাঁর দিকে দৃষ্টি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আদৌ অনুভব করিনি। কিন্তু নিজের গান শেষ ক'রে শান্তিবাবু যখন ঘোষণা করলেন "এবারে কয়েকটি লোকগীতি শোনান হবে" এবং সেই পোঁ ধরা ভদ্রলোক যখন হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে বসলেন মাইকের সামনে তখন আমার মত অনেকের চোখই ছানাবড়া হ'য়ে উঠেছিল।

আজকাল সঙ্গীতের আসরে লোকগীতি পরিবেশনটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমরা সে রকম কোন আয়োজন করে উঠতে পারি নি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ করছিল মনটা। কিন্তু সে অভাব-বোধও স্থায়ী হয় নি শেষ অবধি। সুদে-আসলে তা পূরণ ক'রে দিলেন সঞ্জয়বাবু। অদ্ভুত দরদী গলা ভদ্রলোকের। পদ্মাপারের সেই ভাটিয়ালির মূর্ছনা "মইশাল রে…" রাঢ়ের লাল মাটির অণুতে অণুতে মিশে সুরের রামধনু সৃষ্টি কোরল সাঁঝের আকাশে।

সর্বশেষে নিজের অননুকরণীয় ভঙ্গীতে, স্বভাবসিদ্ধ সুললিত কণ্ঠস্বরে দুখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, সামগ্রিকভাবে অগণ্য রসপিপাসু শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য শান্তিনিকেতনের এই শিল্পীগোষ্ঠি যে সঙ্গীতরস পরিবেশন করলেন তা এক কথায় 'অনবদ্য'। সঙ্গীতের আসর নিঃসন্দেহে আজকের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান যদিও মাত্র দেড়ঘণ্টা ছিল এর আয়ুষ্কাল।

এরপরে আসরে এলেন বাউল প্রেমানন্দ। তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে এটুকু বলতেই হবে যে বিশ্বভারতীর শিল্পীবৃন্দের পর এই তথাকথিত বাউলটি অনেক কসরৎ করেও আসর জমাতে পারলেন না। এঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গীহীন মেজাজই এঁর ব্যর্থতার জন্য বোল আনা দায়ী। এখানে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞান হীনতার পরিচয় পাওয়া গেল।

আজকের শেষ অনুষ্ঠান "কবি-গান"। কবিগানের শিল্পী ছিলেন শিবশঙ্কর পাল ও কিশোরি কুন্ডুই। কবিয়াল হিসেবে উভয়েই খ্যাতিমান কিন্তু তাঁদের আজকের লড়াই "সেকাল ও একাল" যতখানি উপভোগ্য হবে আশা করা গিয়েছিল ঠিক ততখানি যেন হোল না। কিন্তু এঁদের মধ্যে শিবশঙ্কর পাল কিছুটা সংযত ও মার্জিত। কবির লড়ায়ের মধ্যে তাঁর ভাষা ব্যবহারের পরিমিতি বোধ ও শব্দচয়নের কুশলতা প্রশংসার্হ। তাই কিশোরি কুন্ডুইকে ছাড়িয়ে তাঁকেই চোখে পড়ল যদিও তিনি বলবার সময় ও সুযোগ পেয়েছেন সামান্য। কুন্ডুই মশাই আসরের বেশীর ভাগটা জুড়ে ছিলেন।

মোটামুটি আজকের সব কটা অনুষ্ঠানই বেশ উৎরে গ্যাল। কালকের ভাবনা নিয়ে চলেছি সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে। এখনো কিন্তু কানে ভেসে আসছে শিল্পীর সেই গভীর আকুতির ব্যঞ্জনা—

"আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধুলায় ধূসর হব ॥
ঐ আসন তলের…… ॥"

• • • •

১৭ই ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ২॥টা

সব শেষ? একটা অদ্ভুত শূন্যতায় ভরে গ্যাছে সমস্ত সত্ত্বা। কোন কিছু চিন্তা করারও যেন আর ক্ষমতা নেই।

"তারপর জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ মনে যেন আনে,
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে
ভেসে যায় দূরে,
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণ লিখন পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।"

শূন্য মণ্ডপ পড়ে আছে আধো-ঘুমে অচেতন। জানিনা আবার কবে তার ঘুম ভাঙবে। "শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে" তবুও "ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু"। সুরুর সারা আছে—এমনি করেই তো জীবনের ধারা-বাহিকতা।

জানিনা কতক্ষন ঘুমিয়েছিলুম। আচমকা ভেঙে গেল ঘুমটা। জানালার ফাঁক দিয়ে পাঁচিলের গায়ে রাঙা খাওয়া এক চিলতে রোদ চোখে পড়ল; মনে হোল ও যেন ভ্রূকুটি করে বলছে "ওহে ছোকরা, ঘুমোবার সময় অনেক পাবে কিন্তু আজকের যে দুর্লভ সুযোগ আসছে তার সময় আর পাবে না।"

তাই তো কি আজকে! হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে মনের পর্দায় ভেসে উঠল কালকের শেষ হওয়া অনুষ্ঠান-গুলো, আজকের হবু-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাগুলো।

তাই তো এখনি সুরু হবে সাহিত্য-সভা। কত-ক্ষণই বা বাকী আর! তড়াক ক'রে লেপটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠলুন। সাড়ে আটটায় সুরু হবার কথা সাহিত্য-সভা, এদিকে আটটা ত বাজতে চলল। ঘর থেকেই একবার উঁকি মারলুন মণ্ডপের দিকে। নাঃ এখনো বিশেষ সাড়া শব্দ নেই। কোন রকমে এক ঢোক চা গিলেই, খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে ছুটলুম মণ্ডপের দিকে। অবশ্য আজকের সাহিত্যসভার উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল কারণ আগেই শুনে-ছিলুম শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে 'ইন্দ্রজিৎ' এবং ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না। অসুস্থতা নিবন্ধন আসছেন না ডাঃ মুজতবা আলীও। কে জানে কেমন হবে আজকের সভা? মনের মধ্যে একটা দ্বিধা নিয়েই হাজির হলুম মণ্ডপের দিকে।

ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিলেন অধ্যাপক অশোক বিজয় রাহা আর অন্যান্য সকলে কাল থেকেই মজুত। সুতরাং নির্দারিত সময়েই সুরু হোল অনুষ্ঠানের কার্য্য-সূচি।

আজকের সাহিত্যবাসরের পুরোধা ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারী, বাংলার সাহিত্যিক গোষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত তুল্য, সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন দরদী কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো অংশগ্রহণ করলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

"তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি"—ছাত্র-অধ্যাপকের সম্মিলিত কণ্ঠে ভৈরবীর সুর মূর্চ্ছনায় ভরিয়ে তুলল সকালের আকাশ। মাল্য-চন্দনে ভূষিত হলেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি। পুষ্প-স্তবক অর্পণ ক'রে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হোল শ্রদ্ধেয় অতিথি বর্গকে।

সাহিত্য-বাসরের উদ্বোধন করতে এলেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক। উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক মল্লিক বললেন, আজ আমাদের বলার দিন নয়, শোনার দিন। বলি আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে কিন্তু শোনার ক্ষণ জোটে অল্পই। সেই সুযোগ আজ যখন হাতে এসে ধরা দিয়েছে তখন ব'লে সময় নষ্ট করাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। আজ আমরা শুনতে এসেছি তাই শুধু শুনব।

এরপর বলার পালা এল কবি অশোক বিজয় রাহার। বলতে দ্বিধা নেই যে শ্রীরাহার পরিচয় আমাদের খুব সামান্যই জানা ছিল। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং কবি হিসেবে তাঁর নাম শুনেছিলুন। আর শান্তিনিকেতনের লোকেদের মধ্যে থেকে স্বভাবতঃই একটু কবি কবি গন্ধ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজকের আসরে অধ্যাপক রাহা তাঁর অদ্ভুত বাগবৈদগ্ধে এবং বাচন ভঙ্গীর শালীনতায় রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র রম্যবোধের যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিলেন তা প্রতিটি শ্রোতাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশালতা, তত্ত্বের ব্যাপকতা এবং যুক্তির বলিষ্ঠতায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ভারতীয় কাব্যসাধনার ধারা বাঙ্ময় রূপ পরিগ্রহ কোরল। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় যেটা আমরা তাঁর সম্পর্কে পেলুন সেটা হোল তাঁর কবি মানসের পরিচয়। জনৈক শান্তিনিকেতনী ছাত্র-বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম, অধ্যাপক রাহা একদিন বাংলা ক্লাসে অধ্যাপনা করতে করতে

বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রতিটি নুড়িতে এক একটি কাব্য লুকান আছে। কিন্তু সে অস্তিত্বকে পেতে হ'লে চাই সার্থক কবিমানস। অধ্যাপক রাহার মধ্যে আছে সেই কবি-মানস। আজকে সকালের এই কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্যে তাঁর চরিত্রের সেই দিকটাই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল আমাদের সামনে। 'আধুনিক বাংলা কবিতায়' অশোকবাবুর দু একটি টুকরো কবিতা পড়েছিলুম। কিন্তু আজকে মনে হোল

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি বিহারীলাল সম্পর্কে বলেছিলেন —"তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল। তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।"—অশোকবাবুর ক্ষেত্রেও এ উক্তির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে অসার্থক হবে না।

এরপর উঠলেন আমাদের কলেজেরই কৃতী প্রাক্তন-ছাত্র, ইদানীং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বিদগ্ধ সমাজে ডাঃ রমারঞ্জন সুপরিচিত। আজকের আসরে তাঁকে পেয়ে আমরা যথেষ্ট উল্লসিত বোধ করলুম। অধ্যাপক রাহা কবি, ডাঃ রমারঞ্জন প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক রাহা তুলেছিলেন কাব্য বীণায় ঝঙ্কার, ডাঃ রমারঞ্জন বাজালেন গদ্যের দামামা।

জোরাল যুক্তি তথ্যের সন্নিবেশে তিনি সপ্রমাণ করার প্রয়াস পেলেন রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিকতার অভাব। রবীন্দ্রকাব্যের সুরের অপূর্ণতাই ছিল তাঁর বিচার্য্য বিষয়। ব্যাতিমান আধুনিক কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে তিনি দেখালেন যে রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভা আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করলেও বর্ত্তমান যুগ ও জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বঞ্চনার সুর পরতে পরতে ধরা পড়ে নি তাঁর কাব্যে। ভাবরাজ্য থেকে তিনি নেমে আসতে পারেন নি অন্ধগলির শ্বাসরোধী নরকে, খাটালের পচা পাঁকের মাঝে। তাই ভাববিলাসী কবির কাছে সদাগরী আফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হরিপদ আর আকবর বাদসার অন্তর-প্রভেদ অনুভূত হয় নি। এই খানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার ব্যর্থতা। আমরা দর্শনের ছাত্র তাই Dialectics এর দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার ক'রে বলতে হয় Thesis পেশ করলেন অশোকবাবু, antithesis দিলেন ডাঃ রমারঞ্জন আর Synthesis-এর ভার পড়ল ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।' অত্যন্ত সাবলীল গতিতে ডাঃ ব্যানার্জী আলোচনাকে নিয়ে চললেন পরিণতির দিকে। সমালোচক শ্রীকুমারের নাম শুনেছিলুম, তাঁর লেখাও যৎকিঞ্চিৎ পড়েছিলুম কিন্তু এই সমালোচক মানুষটির মুখনিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত, চিন্তাগর্ভ বাণী সত্যই আজ বিস্ময়ে হতবাক ক'রে দিল। অখণ্ডনীয় তত্ত্বপূর্ণ, তথ্যসম্বলিত যুক্তিজাল বিস্তার করে সাহিত্যের যে মূল্যায়ন তিনি আজ করে গেলেন তা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক মহাসম্পদ বললে অত্যুক্তি হবে না। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ওজস্বিতায়, চিন্তার প্রগাঢ়ত্বে তাঁর ভাষণ সহস্রাধিক শ্রোতার উপলব্ধির স্থায়ী রেখাপাত ক'রে গেল। সাহিত্যের শাশ্বত:, চিরন্তন, শিল্পসমৃদ্ধ রূপটি প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল সাহিত্য রসামোদিদের কাছে। বাস্তবের নগ্ন কুটিল ক্লেদাক্ত বীভৎসতাই কাব্যের সার্থক উপাদান হ'তে পারে না। বর্ত্তমান পৃথিবীর পূঞ্জিত বেদনা-বঞ্চনা সাময়িক কিন্তু কাব্য ধ্রুব, কাব্য সত্য, কাব্য দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধচারী, কাব্য মানুষের শাশ্বতঃ মানসলোকবিহারী, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, গ্লানির মানদণ্ডে তার যাচাই চলে না। রবীন্দ্রকাব্য তাই সুন্দরের পূজা, মধুরের আরতি—

"তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য কমল
আনন্দের সূর্য পানে ; তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই।
জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশা[illegible] ঐ দীর্ঘ, জ্ঞানগর্ভ ভাষণের পর তারাশঙ্করবাবু [illegible]হিত্যের আদর্শ ও রূপ নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু এখানে একটু

বিনীত মন্তব্য করার লোভ সামলাতে পাচ্ছি না। মনে হোল সাহিত্যিক তারাশঙ্কর পূর্ব্বতন আলোচনার জের না টেনে যদি একটু স্বতন্ত্রখাতে ওকে বহানর চেষ্টা করতেন, তাহ'লে বোধহয় আমরা অধিকতর লাভবান হতুম। তারাশঙ্করবাবু উঠে যখন বললেন —"আমি গল্প লিখি তাই এতক্ষণ গল্পের প্লট ভাবছিলুম —আজকের এই সাহিত্যসভাকে নিয়ে কিভাবে একটা গল্প ফাঁদা যায়"—তখন আমরা রীতিমত আশান্বিত হয়ে উঠেছিলুম যে হয়ত লেখকের কাছে নতুন কিছু, অভিনব কিছু শুনতে পাব।এই ভেবে। কিন্তু তিনিও যখন আলোচনার মোড় না ফিরিয়ে আগের পথেই তাকে টেনে নিয়ে যেতে সুরু করলেন তখন সত্যিই কথা বলতে কি আমরা একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলুম। অবশ্য তাঁর বাচন ভঙ্গীর মজলিসি ঢঙ ও ভাষার সৌকর্য্য অত্যন্ত মনোরম ও তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু দুঃখ রইল তাঁর কাছে নতুন কিছু শুনতে পেলুম না ব'লে। বারান্তরে লেখক নিশ্চয় আমাদের এ সাধ অপূর্ণ রাখবেন না।

সভাপতি সাহিত্যরত্ন মশায়ও আমাদের সেদিক থেকে নিরাশ করলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বজন বিদিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমার জ্ঞান অবশ্য নাস্তি কিন্তু এর আগে একবার সাহিত্যরত্ন মশায়ের বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। আশা করেছিলুম আজকের আসরেও সেই রকম আলোচনাই শুনতে পাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের [illegible] মামুলি কথা দিয়ে তাঁর [illegible]।

[illegible] এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে [illegible] জ্ঞাপন করলেন অধ্যক্ষমহাশয় এবং ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্তির [illegible]।

[illegible] আজকের সাহিত্যসভা আমাদের এক বিরাট [illegible] সাফল্য। এতখানি জমাটি জলসা, এতদূর উপভোগ্য অনুষ্ঠান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এ ছিল আমাদের ধারণাতীত। যাই হোক নিজেদের ঢাক নিজেদের না পেটানোই ভাল।

কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটা তখনও বাকী ছিল। বেলা ১২টা নাগাদ সাহিত্যসভা যখন শেষ হোল তার বহু আগেই জঠরের অগ্ন্যুৎপাত সুরু হয়ে গিয়েছিল। ও রকম ইন্‌কিলাবি আওয়াজ, ১৭ এর বিপ্লবে উঠেছিল কিনা জানি না। মাথায় কোন রকমে মগ দুই জল ঢেলেই ছোটো ছোটো—সোজা একেবারে New block-এ এসে তবে ক্ষান্ত। বুভুক্ষার দাবদাহ কথাটা শুনেছিলুম কিন্তু জিনিষটা যে কি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলুম আজকে দুপুরে। অশেষ ধন্যবাদ ওঁকে মানে শ্রীভগবানকে নয় আমাদের গোপালবাবুকে। রীতিমত ভুরিভোজনের আয়োজন করেছিলেন তিনি, ইস্তক পঞ্চব্যঞ্জন পরমান্ন মিষ্টান্ন অবধি! পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি উদ্গার তুলে মনে হোল নাঃ আমি এখনও ব্রাহ্মণ। তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলসটা হয়ত ত্যাগ করেছি কিন্তু রক্তে এখনও সেই খানদানি ব্রাহ্মণত্ব নাহ'লে এই অসময়ে হঠাৎ নাচার ইচ্ছা জাগছে কেন? আরো মনে হোল এই হাজারো রকমের উৎসব না ক'রে এই দুদিন যদি স্রেফ্ প্রীতিভোজের আয়োজন করা হত তাতে আর যাই হোক উৎসবের বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হোত না। প্রিন্সিপ্যাল মশাই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"দেখ বাপু পেটটি যদি ভরা থাকে তাহ'লে দেখবে সব কিছুই ভাল লাগবে, তাই আগে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনটি ভাল ভাবে করতে হবে।"—হ্যাঁ লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন স্যার এখন বুঝছি। আর একটা মজা হোল খেয়ে দেয়ে উঠে কেমন একটু ধাঁধা লাগছিল—আচ্ছা কোন অনুষ্ঠানটা সবচেয়ে ভাল হোল, কালকের সঙ্গীতানুষ্ঠান, আজকের সাহিত্যসভা না এই প্রীতিভোজটা। সব যেন গুলিয়ে ফেলছিলুম। যা হোক সে বিচারের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। লম্বা একটা ঘুম দেবার সংকল্প নিয়ে পা বাড়ালুম নিজের ডেরার দিকে। কিন্তু সংকল্প মনেই রয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা এতক্ষণে বিশ্বাসঘাতকের মত পা বাড়িয়েছে ৪টের ঘরের দিকে। এদিকে সন্ধ্যেতে আছে অভিনয়। প্রমোদ বাবু বলে দিয়েছিলেন male dress সব নিজেদের জোগার করতে হবে। কপালের ঘাম মুছে আবার বেরিয়ে পড়লুম এ দোর ও দোর করতে। এর পাঞ্জাবী ওর

ধুতি, তার চাদর সব গুটীয়ে যখন ফিরলুম, সূর্য তখন ডুবু ডুবু। ঘুমটা যাকে বলে একেবারে মাঠে মারা গ্যাল।

অভিনয়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, হেতমপুর রাজ রঙ্গমঞ্চে। মাত্র মাসখানেক আগে এই নতুন রঙ্গমঞ্চটির উদ্বোধন হয়েছে। এই ষ্টেজে মহড়া দিতে গিয়েছি কদিন কিন্তু সেটা মহড়া মাত্র। আজকে সেজে গুজে খেল দেখাতে নেমে কি যে হবে বেশ ভাবিয়ে তুলছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে হেতমপুরের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। বাংলা দেশের মঞ্চ-জগতের পুরোনো ও নয়া জমানার অনেক বাঘা বাঘা রাজা—উজির নাজির পাত্র-মিত্র সভাসদ্ এখানে তাঁদের বিজয় অভিযান চালিয়ে গ্যাছেন আর স্থানীয় অভিনেতারাও অনেকে রীতিমত উঁচু দরের অন্ততঃ তাদের নিজেদের মতে। সুতরাং সেখানে ঢাকের বাদ্যির পাশে আমাদের কাঁসির টীমটীমি দিয়ে আসর জমান নিতান্ত দুরাশা। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত বুক ঠুকে নেমে পড়তে হবে, দু একটা ইট-পাটকেল খেতে হলে আর কি করা যাবে।

প্রথমেই ছিল অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলিত নাট্যাভিনয় মন্মথ রায়ের কৌতুক নাটীকা "মরাহাতী লাখ টাকা।" এই নাটীকাটির মহলা চলার সময় দরজার ফুটো দিয়ে, জানলার ফাঁক দিয়ে দুএকবার উঁকি মারার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারি নি। আজকে মনে হোল না দেখে ভালই করেছি তাহ'লে এতটা রসোপলব্ধি বোধহয় ভাগ্যে ঘটে উঠত না। মাষ্টারমশাইরা যে এত ভাল অভিনয় করবেন তা কে জানত। অদ্ভুত তাঁদের Team work। চমৎকার ভাবে উৎরে গ্যাল 'মরা হাতী লাখ টাকা'; রীতিমত মঞ্চসফল নাটক বলা চলে। অভিনয় নৈপুণ্যে প্রতিটি দর্শকের মন কেড়ে নিলেন এককড়ির ভূমিকায় অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত লক্ষ্মী দেবীর ভূমিকায় শ্রীভূদেব আচার্য, বাহাদুর রায়ের ভূমিকায় অধ্যাপক সত্যেন মুখার্জ্জী, অনিত্য জীবন চৌধুরীর ভূমিকায় অধ্যাপক রথীন লাহিড়ী এবং বিজ্ঞান বিহারী বটব্যালের ভূমিকায় শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়, কিন্তু মাত্র কয়েকটি কথা বলেও না বলে যিনি হাসির বন্যায় মাতিয়ে দিলেন সমস্ত ষ্টেজ, সেই প্রতিভাবান অভিনেতা হলেন পুলিস কনষ্টেবলের ভূমিকায় শ্রীউমাপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর অভিনয় নিঃসন্দেহে 'শ্রেষ্ঠত্বের' দাবী করতে পারে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত।

সত্যি কথা বলতে কি 'মরাহাতী লাখ টাকা' আমাদের আরোগ্য নিকেতনের সাফল্যের পথে শেষ পর্য্যন্ত কণ্টক হয়ে দাঁড়াল। অনেক কসরৎ করেও আমরা বোধহয় জমাতে পারলুম না। 'মরাহাতী লাখ টাকার কেলেঙ্কেরিয়াস 'ক্যাডা-ভারাস' কথা দুটো দর্শকচিত্তে এমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার কোরল যে আমরা ষ্টেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কয়েকবার ও দুটির পুনরুক্তি শুনলুম, জানিনা কার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হোল কিন্তু তখনই বুঝলুম আমরা ব্যর্থ, সার্থক 'মরা হাতী লাখ টাকা, হলফ ক'রে বলতে পারি জীবন মশাই, আতর বৌ প্রদ্যোত ডাক্তার এতখানি স্থায়ী আসন পাবে না দর্শক চিত্তে। আরোগ্য নিকেতন একেবারে ব্যর্থ হয়ত নয় তবু তুলনামূলক বিচারে সফল হোল না বোধহয়। আর এর জন্য অনেকখানি দায়ী নিকৃষ্ট সাজ-পোষাক। জীবন মশায়ের দাড়ি আর বাবড়ির বহর দেখে আমার সর্ব্বপ্রথম মনে হয়েছিল বাল্মীকি প্রতিভার বাল্মীকির কথা। আতর বৌ যেন মা শেতলা আর মঞ্জুকে দেখে মনে হোল কে হোড়ের সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তেলের বিজ্ঞাপন। তবু ব্যক্তি গত নৈপুণ্যে জীবনমশায়ের ভূমিকায় সাতকড়ি সরকার, আতর বৌ তারাপদ মিত্র, শশী কম্পাউণ্ডার-আশানন্দন চট্টরাজ ও দাঁতু ঘোষালের ভূমিকায় মদন সরকার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সান্ত্বনা এই টুকুই যে ইট-পাটকেল শেষ অবধি খেতে হয় নি। ধন্যবাদ এজন্য দর্শকদের যে তাঁরা অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আরোগ্য নিকেতন দেখেছেন 'মরাহাতী লাখ টাকা' উপভোগ করেছেন।

'আরোগ্য-নিকেতনের' যবনিকা নেমে আসার সঙ্গে 'হীরক-জয়ন্তী' উৎসবেরও পরিসমাপ্তি।

মুখের রং তুলতে তুলতে তাই ভাবছিলুম আবার কাল থেকে—

"শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্মভগ্ন অংশভাগ
কলহ সংশয়।"

কিন্তু তবুও মনটা ভরেছিল উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্যে, আর একটা নতুন জিনিষ চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল সেটা হোল ছাত্র-অধ্যাপকদের সম্মিলিত উদ্যোগ, মিলিত ঐকান্তিকতা, পূর্ণ সহযোগিতা। ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে শুধু পুঁথি পড়ার সম্পর্ক নয় আছে স্নেহ-প্রীতি সহমর্মিতা। অধ্যক্ষ মশায় বলেছেন "ছাত্র ও অধ্যাপকদের কোন কৃত্রিম ব্যবধান আমাদের এখানে নেই, একথা সগৌরবে জানাতে পারি। এ উক্তিরই সুষ্ঠু অভিপ্রকাশ আমরা দেখেছি এই হীরক-জয়ন্তী উৎসবে।

নমস্কার

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

অধ্যাপক মণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এম্. এস. সি	অধ্যক্ষ	গণিত বিভাগ
শ্রীসন্তোষ কুমার মুখার্জি, এম্. এ		"
শ্রীগোপাল গোবিন্দ মজুমদার এম্. এস্. সি	উপাধ্যক্ষ	রসায়ন বিভাগ
শ্রীজগদীশ্বর সান্যাল এম্. এ		দর্শন বিভাগ
শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত এম্, এ (দর্শন), এম্. এ (বাংলা)		"
শ্রীহৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস এম্. এ		অর্থনীতি বিভাগ
শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায় এম্. এ (পলিটিক্স) এম্. এ (ইতিহাস), এল্. এল্, বি		"
শ্রীশিবশরণ চৌধুরী এম্. এ, এল্. এল্. বি		ইংরাজী বিভাগ
শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মুখার্জি এম্. এ		"
শ্রীসমীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এ		ইতিহাস বিভাগ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম্. এস্. সি		পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
শ্রীদেবদাস মুখার্জি এম্. এস্. সি		জীববিদ্যা বিভাগ
শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক এম্. এ		বাংলা সাহিত্য বিভাগ
শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যপুরাণতীর্থ	}	সংস্কৃত বিভাগ
শ্রীগিরিধারী প্রসাদ গুপ্ত, সপ্ততীর্থ, শাস্ত্রী	}	

বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের সহায়ক

শ্রীসাহেব আলি, বি. এস্. সি	রসায়ন
শ্রীহিমাংশু রক্ষিত, বি. এস্. সি	পদার্থ বিজ্ঞান
শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ মণ্ডল, বি. এস্. সি	জীববিদ্যা

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

পরিচালক সমিতি

শ্রীডি. এস্. সি. বোনার্জি, আই. এ. এস্, (জেলা সমাহর্তা)	সভাপতি
কুমার রেবতী রঞ্জন চক্রবর্ত্তী	সহ-সভাপতি
মহারাজ কুমারী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী	ট্রাষ্ট প্রতিনিধি
শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ)	সম্পাদক
শ্রীগোপাল গোবিন্দ মজুমদার (অধ্যাপক)	শিক্ষক-প্রতিনিধি
শ্রীঅনাদি নাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ, বি. এল্ } শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি.এ, বি. এল্ }	বিদ্যোৎসাহী

হীরক জয়ন্তী উৎসবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

বিভাগ	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম
উৎস মঞ্চ ও সজ্জা পরিকল্পনা	অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি
নাটকাভিনয়	অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
সঙ্গীতানুষ্ঠান	অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভোজ	অধ্যাপক গোপাল গোবিন্দ মজুমদার
	অধ্যাপক হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস
	অধ্যাপক সন্তোষ কুমার মুখার্জি
অভ্যর্থনা	অধ্যাপক সমীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
	অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরী
সাহিত্য সভা	অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক
সংগঠন সম্পাদক	অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যাল

সহকারী

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
	শ্রীবিমলেন্দু বক্সী
	শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত
	শ্রীকিরীটী ভূষণ পাল
	শ্রীসঙ্কর্ষণ দত্ত
	শ্রীমানিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী